লীলা মজুমদার

নেপোর বই

এক

এটা কিন্তু সত্যিকার নেপোর বই নয়। আসল বইটিকে নেপো নিয়ে চলে গিয়েছিল। পরে যখন পাওয়া গেল, দুমড়োনো, মুচড়োনো, আঁচড়ানো, কামড়ানো, খিমচোনো, কাদামাখা, কালো কালো থাবার দাগ লাগা, কোনো কাজেই লাগে না। কিচ্ছু পড়া যায় না, মাঝে মাঝে খোবলানো ছ্যাঁদা। ভাগ্যিস তাতে কিছু লেখা ছিল না, নইলে হয়েছিল আর কী। শুধু মলাটটাই ভালো ছিল আর তাই দিয়েই গুপি এই বালি কাগজের খাতাটাকে বাঁধিয়ে দিয়েছে। হলদে মলাট, তার ওপর বেগনি কালি দিয়ে লেখা 'নেপোর বই'। নইলে নেপো কিছু এমন সৎ বেড়াল নয় যে ওর নামে বইয়ের নাম রাখব। সৎ হলে আর ওর ল্যাজটা— সে যাক গে। মোট কথা ভজুদা বলেছিলেন বইয়ের নাম রাখতে পানুপুরাণ।

আমার নাম পানু, আমার বয়স বারো। সাত মাস আগে বাস থেকে পড়ে গিয়ে আমার শিরদাঁড়ার হাড় জখম হয়েছিল। সেই থেকে আমি হাঁটতে পারি না। তবে একটু একটু করে গায়ে জোর পাচ্ছি আর ডাক্তারবাবু বলেন আমি নাকি চেষ্টা করলেই হাঁটতে পারব, কিন্তু আসলে তা পারি না। আমার একটা দু-চাকাওয়ালা ছোটো গাড়ি আছে, দাদু করিয়ে দিয়েছেন, তাতে করে আমি বাড়িময় ঘুরে বেড়াই। তাতে বসেই আমি আমাদের তিন তলার ফ্ল্যাটের প্রত্যেকটি জানলা দিয়ে রাস্তা দেখি। তা যদি না দেখতাম তা হলে আর এ বই লিখবার দরকারই হত না। কিছু টের-ই পেতাম না।

বেশিরভাগ সময় আমি নিজের ঘরে থাকি আর নিজের জানলা দিয়ে দেখি। আমার ঘরে দুটো জানলা। একটার নীচে, বাইরে কার্নিসের উপর লম্বা টিনের টবে বড়ো মাস্টার আমাকে গাছ-গাছলা করতে শিখিয়েছেন। অদ্ভুত চেহারার সব কাঁটাগাছ, কী সুন্দর ফুল ফোটে। অথচ রোদ লাগলেও মরে না, গরমের সময়ও শুকোয় না। রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে গুনে এক মগ জল দিতে হয়।

অন্য জানলার নীচে ভজুদার টব, তাতে ধনে পাতা, রসুন, কাঁচালঙ্কা, টোমাটো ফলাই। বড়ো মাস্টারের পোড়া বউও নাকি ওঁদের ছাদের কোণে জলের ট্যাঙ্কের পাশে গাছ গজায়, বেল, জুঁই, রজনীগন্ধা; কুমড়ো গাছে কুমড়ো হয়, মাটির হাঁড়ির তলা ফুটো করে তাতে পুঁই ডাঁটা হয়। বউকে কেউ নাকি চোখে দেখেনি। তবে দূর থেকে জানলা দিয়ে ওর ঘোমটাপরা মাথা দেখতে পাই। আগে নাকি বউ পরমাসুন্দরী ছিল, দূর থেকে লোকে তাকে দেখতে আসত। তারপর আধখানা মুখ পুড়ে কালি হলে পর আর কারো সামনে বেরোয় না। তাই নিয়ে বড়ো মাস্টার কত দুঃখ করেন। বলেন, 'সংসারের সব-ই অসার।'

বড়ো মাস্টার প্রত্যেক রবিবার বিকেলে আমাকে গল্প বলতে আসেন। ওই সময় আমাদের বাড়ির সবাই বেড়াতে চলে যায়, খালি রামকানাই থাকে। সে আমাদের জন্যে চা আর মাছের কচুরি, মেটুলির ঘুগনি, এইসব করে দেয়। আটটার সময় বাড়ির লোকেরা ফিরে এলে, বড়ো মাস্টার বাড়ি যান।

পাশেই বাড়ি; আসলে ছাপাখানা। আমাদের বাড়ির গলি দিয়ে মাপলে আট ফুট তফাতে। একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি ও-বাড়ির চার তলা থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে এক তলা অবধি নেমে গেছে। সেটা থেকে মাপলে আরও কাছে। গুপি বলে আমাদের ঘোরানো সিঁড়ি থেকে রং মিস্ত্রিদের একটা তক্তা ফেলে ও নাকি ওদের ঘোরানো সিঁড়িতে গিয়ে উঠতে পারে। তবে বড়ো মাস্টার থাকেন পাঁচ তলার উপরে ছাদের কোণে দুটো ঘরে, ঘোরানো সিঁড়ি অত দূর ওঠে না। বড়ো মাস্টার ছাপাখানার ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করেন।

ওইখানে উনি প্রুফ দেখেন, তাই ঘর পান। সন্ধ্যে বেলায় ছাপাখানার বড়ো সাহেবরা চলে গেলে, তাদের গাড়ির শেডে মাস্টারের নাইট স্কুল বসে, তার জন্যে সামান্য মাইনে পান। কষ্টেসৃষ্টে দিন চলে, বড়ো মাস্টার বলেছেন। অথচ এককালে কী বড়োলোকমিটাই-না করেছেন। শুনে কষ্ট হয়।

রবিবার ছাড়া রোজ সকালে ভজুদা এসে আমাকে তিন ঘণ্টা পড়ান, আটটা থেকে এগারোটা। ক্লাসের বই নিয়ে ঠেসে পড়ান, ইংরিজি, অঙ্ক, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, হিন্দি, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান। কী না জানেন ভজুদা। ছবি-দেওয়া মোটা মোটা বই এনে আশ্চর্য সব ছবি দেখান। মরুভূমির বালিতে চাপাপড়া হেলিওপোলিসের রাস্তার প্রাচীন কালের রথের চাকার দাগ, আরো কত কী!

ভজুদা খুব ভালো, কিন্তু বেজায় কড়া। আমি তো বাড়িতে বসেই বার্ষিক পরীক্ষা পাস করে উপরের ক্লাসে উঠেছি। এ-বছর সাতজন নতুন নতুন ছেলে ভরতি হয়েছে আমাদের ক্লাসে। তাদের কাউকে অবিশ্যি এখনও দেখিনি, গুপির কাছে সব খবর পেয়েছি।

গুপি আমার বন্ধু। প্রত্যেক রবিবার আর ছুটির দিনে সে আমাকে দেখতে আসে। বড়ো মাস্টারের গল্প শোনে, অদ্ভুত সব গল্প। ওঁর সত্যিকার অভিজ্ঞতার কাহিনি। বর্মার গল্প; প্রশান্ত মহাসাগরে আশ্চর্য সব দ্বীপের গল্প, যার কথা কেউ জানে না; সমুদ্রে ঝড়ের গল্প, জাহাজডুবির গল্প, যুদ্ধের গল্প, ভয়ংকর সব অগ্নিকাণ্ডের গল্প; উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর কথা। মেক্সিকো, ব্রেজিল, কোথায় যাননি বড়ো মাস্টার, ব্যাবসার খাতিরে! তারপর বউ পুড়ল, মাস্টারের বাঁ ঠ্যাং কাটা গেল, ঘোরাঘুরি ঘুচল। 'একদিন যে মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করত, আজ সে সামান্য ক-টা টাকার জন্যে সরকারি ছাপাখানায় কপালে এক জোড়া ম্যাগনিফাইং চশমা এঁটে প্রুফ দেখে আর সন্ধ্যে বেলা নাইট স্কুল চালায়।'

এই অবধি বলে, পা ঠুকে বড়ো মাস্টার হেসে বললেন, 'তাতে কোনো দুঃখ নেই, একটু সময় পেলেই নিজের জীবনের সত্যিকার অভিজ্ঞতাগুলো লিখে ফেলব। প্রকাশকরা দু-পাতা পড়লেই লুফে নেবে। তখন আমার আবার লাখপতি হওয়া ঠেকায় কে! তোকেও কিছু টাকা দেব।'

মাস্টারের বাঁ ঠ্যাং হাঁটুর নীচে থেকে কাটা। তার জায়গায় চামড়ার স্ট্র্যাপ আর বগলেস দিয়ে একটা কাঠের ঠ্যাং আঁটা। দেখতে অনেকটা টেবিলের পায়ার মতো। মাঝে মাঝে গল্প বলতে বলতে বেশি হাত পা ছুড়লে সেটা ফস করে বেরিয়ে আসে। অনেক কষ্টে আবার পরাতে হয়; আমরা সাহায্য করি, মাস্টার ঘেমে নেয়ে ওঠেন। নাকি বড্ড লাগে। অনেক দিন আগে নাকি প্রশান্ত মহাসাগরে বাকি পাটা হাঙরে খেয়েছিল। অনেক কষ্টে দু-মাইল সাঁতরে তবে প্রাণে বেঁচেছিলেন। তা-ও বাঁচতেন না; ভাগ্যক্রমে হঠাৎ শোঁ শোঁ করে সাইমুন ঝড় উঠল, তিন তলার সমান ঢেউ

আছড়ে পড়তে লাগল! প্রাণের ভয়ে শিকার ছেড়ে হাঙর সমুদ্রের তলায় ডুব দিল। অবিশ্যি ঠ্যাংটা সঙ্গে নিতে ভুলল না। বড়ো মাস্টার খোলামকুচির মতো ঢেউয়ের সঙ্গে উঠতে পড়তে লাগলেন।

ভাগ্যিস একটা বড়ো তেল ট্যাঙ্কারের দয়ালু কাপ্তেন ঠিক সেই সময় তাঁকে দেখতে পেয়ে, পঞ্চাশ মণ তেল ঢেলে ঢেউ শান্ত করে, তাঁকে জাহাজে টেনে তুলেছিলেন, নইলে সেযাত্রা হয়ে গিয়েছিল আর কী! এ ঠ্যাংটা আসলে ওই জাহাজেরই রান্নাঘরের একটা ভাঙা টেবিলের পায়া। নাবিকদের দয়ার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে মাস্টার ওটাকে এখনও রেখেছেন। নইলে ছাপাখানার বড়ো সাহেবের চিঠি নিয়ে গেলে সস্তায়, এমনকী হয়তো বিনি পয়সাতেই, কত ভালো ভালো ঠ্যাং কিনতে পাওয়া যায়, অ্যালুমিনিয়মের কাঠামোর উপর রবার দিয়ে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। সত্যিকার পা থেকে দেখতে কোনো তফাত নেই। বরং ঢের ভালো, আলপিন ফুটলেও টের পাওয়া যায় না। 'তবে এই টেবিল-পায়ার ঠ্যাংটাই-বা মন্দ কি? বন্ধুদের দান!'

এই বলে বড়ো মাস্টার আমার যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে লম্বা একটা পেরেক নিয়ে কেঠো পায়ের গোড়ালির কাছে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে নিলেন। নাকি বোলতায় গর্ত করেছিল। পরে মাস্টার কেঠো পায়ের গুলির কাছে ছোটো একটা দেরাজ করে নেবেন; তাতে পয়সাকড়ি রাখবেন, কাকপক্ষীও টের পাবে না। যা পকেটমারের দাপট আজকাল!

বড়ো মাস্টার চলে গেলে গুপি পকেট থেকে কাগজে-মোড়া একটা মলাট-ছেঁড়া বই বের করল। বইটার নাম 'পুষ্পক থেকে প্লেন'। গুপির ছোটোমামার বই। অনেক কষ্টে জোগাড় করা। আশ্চর্য সব বই আনে গুপি। মঙ্গলের মানুষ, বুধে বিপত্তি, চন্দ্রনাথের চন্দ্রযাত্রা, এইসব। একটা টাইমমেশিনের বই এনেছিল; ওই মেশিনে চেপে অতীতে ভবিষ্যতে যে সময়ে ইচ্ছা যাওয়া-আসা যায়। পড়ে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। তা ছাড়া কলের মানুষের গল্প আনে, তাদের রোবো বলে।

এই সবই আমাদের ভালো লাগে। আমরা বড়ো হয়ে প্রথমেই চাঁদে যাব। গুপির ছোটোমামা নাকি চাঁদে জমি কিনবেন। সেখানে ছোটো একটা বাড়ি করবেন, তাতে মেশিনে রান্না হবে। তাহলে তো আমাদের সেখানে গিয়ে কোনো অসুবিধাই হবে না। খালি তার আগে আমার পা দুটোকে সারিয়ে নিতে হবে। এদিকে ছোটোমামা বি.এস্‌সি. পাস করেই মহাকাশযান বানাতে শিখবেন। এখন থেকেই তার জন্যে টিন, অ্যালুমিনিয়ম, রবার, বল্টু এইসব জমাচ্ছেন।

দুই

এর মধ্যে আবার গুপির জন্মদিন করা গেল। আমার ঘরে; ভজুদা আর বড়ো মাস্টারমশাইকে নেমন্তন্ন করা হল। সেদিন ছিল রবিবার, আমাদের বাড়ির সবাই বিকেলে চা খাবার পর অন্যান্য রবিবারের মতো দাদুর বাড়ি চলে গেল। খুব ভালো চা হয়েছিল; কোকা-কোলা, ছাঁচি পান, মাংসের শিঙাড়া, আলু নারকেলের ঘুগনি, আইসক্রিম। গুপিদের বাড়িতে কারো জন্মদিন হয় না। গুপির দাদু বলেন জন্মদিন করলেই নাকি লোকেরা মারা যায়। অথচ ওঁরা কারো জন্মদিন করেন না, তবু ওঁদের পূর্বপুরুষেরা কেউ বেঁচে নেই। তার মানে জন্মদিন না করলেও লোকেরা মরে।

ভজুদার কাজকর্ম সেরে অনেক দেরি করে আসার কথা। প্রথমে গুপি এসেই 'চাঁদের যাত্রী' বলে দু-টাকা দামের একটা চমৎকার বই আমার হাতে দিল। আমি ওই বইটা আর বালিশের তলা থেকে দুটো টাকা নিয়ে গুপিকে দিলাম। ওর জন্মদিনের উপহার। প্রথম পাতায় লিখে দিলাম, 'চাঁদের যাত্রীকে জন্মদিনে চাঁদের যাত্রী দিলাম, ইতি, চাঁদের যাত্রী।' বেশ হল-না?

গুপির ঠাকুরদা এসব বইয়ের উপর হাড়ে চটা। তিনি একসময় জাহাজে চাকরি করতেন। গুপি বলে পৃথিবীতে হেন সাগরতীর নেই যেখানে ওর ঠাকুরদা যাননি। এমনসব অদ্ভুত জিনিস তাঁর নিজের চোখে দেখা যে তিনি আর কল্পনায় বিশ্বাস করেন না। অবিশ্যি অত বড়ো চাঁদকে কিছু কল্পনার জিনিস বলা যায় না। আবহমান কাল থেকে লোকে তাকে দেখে আসছে, তার টানে সমুদ্রে জোয়ার উঠছে; রাশিয়ানরা আমেরিকানরা সেখানে রকেট নামিয়েছে পর্যন্ত; এইসব ছবি দিয়েই 'চন্দ্রযাত্রী' বইটার পাতার পর পাতা ভরতি। যেখানে গাড়ি-ঘোড়া নামানো যায়— আর রকেটকে গাড়ি-ঘোড়া ছাড়া আজকাল আর কী বলা যায়?— যেখানকার ডাঙায় যন্ত্র নামিয়ে ফোটো তুলে পাঠানো যায়, সে এই পৃথিবীটার চেয়ে কোন দিক দিয়ে বেশি কাল্পনিক হল তা ভেবে পাওয়া যায় না। মোটেই পৃথিবীর সব জায়গার ফোটো তোলা হয়নি।

সমস্ত বইটা গুপি এরমধ্যে একবার পড়ে ফেলেছে। অদ্ভুত জীবনযাত্রা ওখানকার। নাকি মহাকাশ-ট্রাকে করে মাটি নিয়ে গিয়ে তবে ধান-গম ফলাতে হবে। তাও সম্ভবত মাটির নীচে খেত বানিয়ে। সূর্যর এমনি তেজ যে দিনের তাপমাত্রা + ২০০ ডিগ্রি আর রাতের – ২০০ ডিগ্রি! সব ঝলসিয়ে জমিয়ে শেষ করে দেবে। যদি-না মাটির তলায় ফসল ফলানো হয়। এক ফোঁটা জল নেই, দু-ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন মিলিয়ে জল তৈরি করতে হবে। সে একেবারে বোতলে-পোরা বিশুদ্ধ জল, খেলে কারো অসুখ করবে না। অক্সিজেনও ওখানে পাওয়া যাবে না, সম্ভবত হাইড্রোজেনও না। সব পৃথিবী থেকে নিয়ে যেতে হবে। বাঁচতে হলে সবাইকে বোতল-ভরা অক্সিজেন শুঁকতে হবে। গুপির ছোটো মামা তার মস্ত ব্যাবসা করে, দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠবেন। আগেই বলেছি যাঁরা প্রথম চাঁদে জমি কিনবে, গুপির ছোটো মামা তাদের মধ্যে একজন। এই ব্যাপারে তিনি আমেরিকায় এরই মধ্যে একটা দরখাস্ত পর্যন্ত দিয়ে রেখেছেন। প্যান্-আম্ নাকি টিকিট বিক্রি করবে।

অবিশ্যি ওঁদের বাড়িতে এ-বিষয়ে কেউ এখনও কিছু জানে না। কারণ গত বছর সামান্য কয়েকটা নম্বরের জন্যে বি.এস্‌সি. পাস করতে না পারায়, বাড়িতে তাঁকে উদয়াস্ত যা নয় তাই শুনতে হয়। তাতে অবিশ্যি তাঁর চাঁদের ব্যাবসা কিছু উঠে যাচ্ছে না, ছোটো মামা গুপিকে বলেছেন, পরে এরাই কত খোশামোদ করবে।

গুপি বইটাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'আমরাও ওই ব্যাবসায় ঢুকে পড়ব। ছোটো মামার চাঁদের বাড়িতে থাকব, মেশিনের সাহায্যে ওর কাজ-টাজ করে দেব। তুই তো খুব ভালো মাংস

রেঁধেছিলি সেবার যখন ডায়মন্ড হারবারে পিকনিক হয়েছিল। আর দ্যাখ, নেপাকেও নিয়ে যাওয়া যাক। দেখিস কেমন দেখতে দেখতে এই বিরাট বাঘের মতো হয়ে যাবে। ওখানে বাতাসের প্রেসার নেই বলে সবাইকে প্রেসার সুট পরতে হবে। নেপোকে পরাব না। বাতাসের চাপ না থাকায় ব্যাটা এই এত উঁচু হয়ে উঠবে, বেশ আমাদের বাড়ি পাহারা দেবে। ওদিকে প্যান্টের মধ্যে পুরে লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারব, কেউ টেরও পাবে না। নইলে বেড়ালদেরও চাঁদে যেতে মোটা টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে হবে।'

বড়ো মাস্টার সঙ্গে করে তাঁর নতুন ছোটো মাস্টারকে নিয়ে এসেছিলেন। রোগা, ফর্সা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পাতলা চুল, নাকি সবে টাইফয়েড থেকে উঠেছেন। দু-জনে হাঁ করে গুপির কথা শুনছিলেন আর একটার পর একটা অনেকগুলো মাংসের শিঙাড়া খাচ্ছিলেন। ভজুদা তখনও আসেননি।

গুপি বলে চলল, 'ওখানে খুব রোবো ব্যবহার হবে। তারাই চাষ করবে, কারখানায় কাজ করবে। নইলে অত অক্সিজেন কে জোগাবে? তা ছাড়া রোবোদের খিদেও হয় না, অসুখও হয় না, ভারি সুবিধা। নইলে চাঁদে গোরু-মোষ নিয়ে গেলে, সেগুলো তো দেখতে দেখতে আট নয় ফুট উঁচু হয়ে উঠবে। তাদের খাবার জোগাতেই ট্যাঁক গড়ের মাঠ হবে। মাটির তলায় বাঁধা থাকবে, গোয়ালে অক্সিজেন ভরা থাকবে। রোবোরা তাদের দুইলে মন মন দুধ পাওয়া যাবে। কে জানে ছোটোমামাও হয়তো একটা গোরু কিনে ফেলতে পারে। পায়েস আর রসগোল্লা করাটা ইতিমধ্যে শিখে নিস, পানু।'

বড়ো মাস্টার একটু চা খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে এতক্ষণে কথা বললেন, 'অত অক্সিজেন কোথায় পাবে?'

গুপি খুব হাসতে লাগল, 'ছোটোমামা বলেছে যেসব কারবন ডাই-অক্সাইড আমরা নিশ্বাস ফেলব, সেগুলোকে আবার অক্সিজেন বানাবার ব্যবস্থা হচ্ছে শিগ্‌গির। একরকম গাছের সাহায্যে।'

নতুন মাস্টার এবার বললেন, 'কিন্তু বদ্ধ বালতিতে দুধ দুইতে হবে, নইলে ছলকিয়ে সব বেরিয়ে আসবে। হাওয়ায় চাপ নেই তো!'

বড়ো মাস্টার মাথা নাড়তে লাগলেন। উনিও গুপির ঠাকুরদার সঙ্গে একমত। এই পৃথিবীটারই সব কিছু দেখার সময় হয় না, তা আবার চাঁদে যাওয়া। গুপি বিরক্ত হয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আমি বললাম, 'চাঁদে যাওয়াটাই আসল কথা নয়, মাস্টারমশাই। চাঁদটা হবে একটা ছোটো স্টেশন। সেখানে মহাকাশের আপিস থাকবে; ওইখানে অন্যান্য গ্রহে যাবার টিকিট কাটা যাবে। কারখানা থাকবে, মহাকাশযান মেরামত হবে। চাঁদে আমরা চিরকাল থাকব না।'

মাস্টারমশাই হঠাৎ গুপির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বর্মা গিয়েছ কখনো?' গুপি মাথা নাড়ল। মাস্টার বললেন, 'আমি বর্মায় থাকতাম। সালওয়েন নদীর ধারে সেগুন কাঠের মস্ত ব্যাবসা ছিল। আমার বাবা অনেক টাকা করেছিলেন। আমাদের নিজেদের এরোপ্লেন ছিল, নৌকো ছিল, মাঝসমুদ্রে যাবার বড়ো বড়ো মোটরবোট ছিল। সমুদ্রের ঝড় দেখেছ কখনো?'

গুপি একটা চেয়ারে বসে পড়ে, সেটাকে টেনে মাস্টারের খুব কাছে নিয়ে গেল। ততক্ষণে আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, বাড়ির সবাই দাদুর বাড়ি চলে গেছে। ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে, তবু আমার ঘরে আলো জ্বালা হয়নি, ভজুদাও আসেননি, মাস্টার বললেন, 'একবার দারুণ ঝড়ে পড়েছিলাম। তখন আমার কুড়ি বছর বয়স। রেঙ্গুনের কলেজ থেকে সবে বি.এ. পাস করে বেরিয়েছি। মাঝিদের সঙ্গে মাঝসমুদ্রে মাছ ধরতে গেছিলাম। ওখানে ওরা প্রকাণ্ড সব মাছ ধরে,

এক মন, দেড় মন, পর্যন্ত। সমুদ্রের জলটা এত পরিষ্কার যে অনেক নীচে অবধি দেখা যায়। কোথাও কোথাও তলা অবধি দেখতে পাচ্ছিলাম। হয়তো সমুদ্রের নীচে সেখানে চড়া পড়েছিল। সূর্যের আলো সেখানে ফিকে সবুজ হয়ে পৌঁছোচ্ছিল। দেখলাম বড়ো বড়ো সমুদ্রের আগাছা, জলের নীচে বালির উপর একটু একটু দুলছে। মাঝে মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোটো রঙিন মাছের দল ভেসে যাচ্ছে। থেকে থেকে বড়ো বড়ো কালো ছায়ার মতো কী যেন এগিয়ে আসছে। তাই দেখে মাঝিরা কথা বন্ধ করে একেবারে চুপ; নোঙর-ফেলা নৌকোটাও স্থির, শুধু ঢেউয়ের দোলায় একটু একটু দুলছে। একবার মনে হল জলের নীচে মস্ত একটা চোখ আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল। গাটাও কেমন শিরশির করতে লাগল। তখনও আমার দুটো ঠ্যাং ছিল না। এখন আর কেয়ার করি না।

'মাঝিদের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারাও কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। নোঙর তুলে, ডাঙায় ফেরার দিকে তাদের মন। নাকি ঝড় উঠছে। দেখতে দেখতে হাওয়া পড়ে গেল, পশ্চিম দিকে মেঘ জমা হতে লাগল। তার পরেই সূর্যটা একেবারে মুছে গেল। দোতলার সমান উঁচু কালো ঢেউ আমাদের উপর লাফিয়ে পড়তে লাগল। ছোট্ট একটা খেলনার মতো আমাদের নৌকোও একবার ঢেউয়ের মাথায় ওঠে, তার পরেই ঝপাস করে পড়ে। মাঝিরা ওস্তাদ, তারা ঠিক হয়ে রইল। পরে জানতে পেরেছিলাম যে ঢেউয়ের ঝাপটা খেতে খেতে শেষপর্যন্ত তারা পরদিন ভোরে আধমরা অবস্থায় নিরাপদ ডাঙায় পৌঁছোতে পেরেছিল। কিন্তু ঝড়ের গোড়ার দিকেই একটা মস্ত ঢেউ আমাকে ভাসিয়ে নিল।

'খানিকটা হাঁসফাঁস করলাম, তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান হল দেখি মহাসাগরের মাঝখানে একটা অজ্ঞাত দ্বীপের বালির তীরে পড়ে আছি। সে কী দ্বীপ! সত্যি বলছি তোদের, পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে সে সেইখানে। মানুষের বাস নেই; বনমানুষেরা উঁচু গাছে রাত কাটায়। শিম্পাঞ্জিকে বনমানুষ বলে তা জানিস তো? আর গাছে গাছে যত ফুল তত ফল। কত যে পাখি তার ঠিকানা নেই। উড়ে এসে কাঁধে বসে, হাত থেকে ফল খায়। ঘাসের উপর খরগোশরা লাফিয়ে বেড়ায়, আমাকে দেখে এতটুকুও ভয় পায় না। দলে দলে হরিণ চরে বেড়ায়। গাছের কোটরে এত বড়ো বড়ো মৌচাক।

'সারাদিন গাছের পাতার মধ্যে সমুদ্রের হাওয়ার শব্দ, পাখির গান, ঝরনার জল পড়ার আওয়াজ। চোখের সামনে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি ওড়ে; তার পিছনে হলদে বালির তীরে সমুদ্রের সবুজ ঢেউ সারাক্ষণ আছড়ে পড়ে।'

মাস্টারমশাইয়ের কথা শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে থেকে অন্ধকারে-ভরা নিজের ঘরটা কোথায় মুছে গেল, ফুটপাথের চায়ের দোকানের ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ আমার নাক অবধি পৌঁছোল না, গা শিরশির করতে লাগল। গুপি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তারপর সেখান থেকে ফিরে এলেন কী করে? কেন এলেন? ই-স্, সেখানে নিশ্চয় গাছে চড়লেই পাখির ডিম! আর হরিণ মারা আর খাওয়া! আচ্ছা, মাস্টারমশাই খরগোশের মাংসও—'।

মাস্টারমশাই হঠাৎ কর্কশ গলায় বললেন, 'চুপ!— ঢিল ছুঁড়ে একটা সবুজ পায়রাকে জখম করেছিলাম। মাটিতে পড়ে সেটা ছটফট করছিল; চোখের কোনা দিয়ে একটু রক্ত গড়াচ্ছিল। অমনি শিম্পাঞ্জির দল আমার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, একটা নারকোল গাছের গুঁড়ি পড়েছিল, তাতে আমাকে চাপিয়ে, ঠেলে ঠেলে ঢেউ পার করে দিয়ে এল। ভাটার টানে কোথায় যে ভেসে গেলাম

তার ঠিক নেই। ভাগ্যিস একটা জাপানি সদাগরি জাহাজের চোখে পড়ে গেলাম, নইলে সেযাত্রা হয়েছিল আর কী!' মাস্টারমশাই হঠাৎ কাঠের পা ঠুকে উঠে পড়লেন।

গুপি বলল, 'এক্ষুনি চলে যাবেন না, মাস্টারমশাই, কী করে বর্মা ছেড়ে চলে এলেন, বউঠানের কী করে মুখ পুড়ল, সেসব কথা—।'

মাস্টারমশাই বেজায় রেগে গেলেন। আমাকে বললেন, 'তোরা বড়ো বেশি কথা বলিস। অন্য লোকের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে খুব মজা পাস, না?'

আমি বললাম, 'না মাস্টারমশাই, না। আমাদেরও দুঃখ হয়, মজা পাই না।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, থাক এখন। আরেক দিন বলব। উঠি। আমার নাইট স্কুলের ছেলেরা এক্ষুনি আসবে। মিটিং আছে। তলাপাত্র রইল, ওর সঙ্গে গল্প কর।'

মাস্টারমশাই চলে গেলেই ছোটো মাস্টার মোড়া থেকে উঠে সেই চেয়ারে বসে বললেন, 'আমার কাছে মহাকাশযাত্রা সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো ইংরিজি বই আছে।'

গুপি হঠাৎ মুখের উপর আঙুল রেখে বলল, 'চুপ করে শুনুন! ওইযে ঠক্-ঠক্-ঠক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন-না? স্পেসশিপ বানাচ্ছে।'

ছোটো মাস্টার চমকে গিয়ে আর একটু হলে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম, 'আঃ গুপি! সবাইকে সব কথা বলা কেন?'

কিন্তু ছোটো মাস্টারও কিছুতেই ছাড়বেন না, 'কী স্পেসশিপ, কে বানাচ্ছে বলতেই হবে! আমাকে না বলার কারণ নেই। আমি তো আর কাউকে বলতে যাচ্ছি না!'

তখন আমি বললাম, 'সরকারি ছাপাখানার ওপাশে চার বছর ধরে ওই যে মস্ত বাড়িটা তৈরি হচ্ছে, গুপি বলে ওখানে মহাকাশযান তৈরি হচ্ছে।'

ছোটোমাস্টার তো অবাক। 'সে কী? শুনলাম ওটা ঠান্ডাঘর। ওখানে আলু পেঁয়াজ জমা থাকবে। ও-পাশেই গঙ্গা। লম্বা চোঙাপথ দিয়ে একেবারে জাহাজের খোলে মাল বোঝাই হয়ে বিদেশে যাবে। বড়ো মাস্টার তো তাই বললেন।'

গুপি কাষ্ঠ হেসে বলল, 'ঠান্ডাঘর করতে কখনো চার বছর লাগে?'

তিন

ঠিক এই সময় কলেজের বিকেলের ক্লাস সেরে ভজুদা এসে উপস্থিত হলেন। মুখে শুধু এক কথা। ওঁদের কলেজের প্রিন্সিপালের নতুন গাড়ি দিনদুপুরে, কলেজের গেটের ভিতর থেকে, একরকম দরোয়ানের নাকের ডগার তলা দিয়ে চুরি গেছে। এই অবধি শুনে ছোটো মাস্টার সুড়সুড় করে সরে পড়লেন। মা-বাবাও তখনি বাড়ি এলেন। সিঁড়িতে ছোটো মাস্টারের সঙ্গে দেখা।

ঢুকেই বাবা আমাকে বললেন, 'কে ওই স্লিপারি কাস্টমারটি? সোজা তাকায় না কেন?'

মা-ও বললেন, 'যাকে তাকে ঘরে ঢোকাস নি বাবা, কতবার বলেছি।'

আমি রেগে গেলাম, কিন্তু কিছু বলার আগেই গুপি আস্তে আস্তে বলল, 'না মাসিমা, উনি ভালো লোক, বড়ো মাস্টারমশাইয়ের নতুন অ্যাসিস্টেন্ট। ওঁর নাম তলাপত্র, এম. এ. পাস।'

বাবা বসে পড়ে বললেন, 'কোত্থেকে ধরে আনে এসব লোক? যেভাবে মাথা নীচু করে পাশ কাটিয়ে হন হন করে নেমে গেল, আমি ভাবলাম নির্ঘাত কিছু সরিয়েছে। কেমন আছ, ভজু?'

আমি বললাম, 'ভজুদাদের প্রিন্সিপালের নতুন গাড়ি হাওয়া।'

বাবা চমকে উঠলেন! 'আরে, তোর মেজোকাকুর গাড়িও যে পোস্টাপিসের সামনে থেকে ঠিক সাত মিনিটের মধ্যে ডিস্যাপিয়ার্ড!'

মা বললেন, 'কাল সন্ধ্যে বেলায় গেছে আর আজ দুপুরে চিড়িয়া মোড়ে পাওয়া গেল। সুখের বিষয়, পাঁচটা টায়ার, ব্যাটারি, যন্ত্রপাতির বাক্স আর হেডলাইট ছাড়া কিচ্ছু হারায়নি। থানার ওঁরা বলেছেন, পুরোনো হলে নাকি এইভাবে পাওয়া যায় আর নতুন হলে বেমালুম উধাও। আসবে ঠাকুরপো একটু বাদেই, তার কাছেই শুনো সব কথা।'

বাবা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'স্রেফ বিদেশে পাচার। বিদেশ তো এখন বেশি দূর নয়। পদ্মাও পার হতে হয় না।' তারপর ভজুদার কাছে শুনলাম যে এই গাড়ি চুরির ব্যাপারেও একটা ভালো দিক আছে। গড়ে নাকি এই কলকাতা শহর থেকেই রোজ একটা করে গাড়ি চুরি থানায় রিপোর্ট হয়। বেশ কয়েক হাজার বেকার লোক এই দিয়ে করে খাচ্ছে। সেটাকে খুব খারাপ বলতে পারলাম না। তবু একটু সাবধানে থাকাই ভালো। ভাগ্যিস দাদুর দেওয়া আমার এই দু-চাকার গাড়িটা তিনতলা থেকে নামে না। তবু আজ রাত থেকে ওটাকে আমার পায়ের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে সুতো দিয়ে বেঁধে রাখব। এতটুকু টান পড়লেই চোর বাছাধন হাতে-নাতে ধরা পড়বেন। হতে পারে আমি চলতে পারি না, কিন্তু হাতে আমার খুব জোর। তা ছাড়া রাতে আমার ঘরে রামকানাই শোয়। সে রোজ ভোরে উঠে আদা দিয়ে ছোলা ভিজে খেয়ে, আধ ঘণ্টা বুকডন করে আর মুগুর ভাঁজে। খুব ঘামে।

গুপি বাড়ি যাবার জন্য উঠেছিল এমন সময় মেজোকাকু একজন মোটা বেঁটে লোককে নিয়ে উপস্থিত। লোকটাকে আগেও কাকুর বাড়িতে দেখেছি। ওঁর নাম নিতাই সামন্ত। ডাক নাম কানু। মেজোকাকু বলছেন নাকি দুঁদে ডিটেকটিভ, ওঁর ভয়ে অনেক ঘাটে বাঘে গোরুতে একসঙ্গে জল খায়। গাড়ি চুরির কথায় বললেন, 'ওরা জানে না, কিন্তু ওদেরও এবার দিন হয়ে এসেছে। যে সে নয়, এবার বাছাধনরা বিনু তালুকদারের পাল্লায় পড়েছে। দিল্লির পুলিশের বিখ্যাত গোপন গোয়েন্দা বিনু তালুকদার। এদিকে অক্সফোর্ড থেকে বি.এ. পাস। নিজের চোখে না দেখলেও শুনেছি দেখে নাকি মনে হয় রোগা লিকলিকে নিরীহ মাস্টারমশাই, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। ওদিকে স্রেফ ম্যাজিশিয়ান!'

গুপি বলল, 'ও মোটর চোরদের ধরে দেবে?'

—'দেবে না তো কী! তাদের ঘাঁটিসুদ্ধ বের করে দেবে। এবার আর ছাড়ান-ছোড়ন নয়। তালুকদার বলে গাড়িগুলো একবার গেল তো গেল! যতক্ষণ না চোররা ইচ্ছা করে পথের ধারে ফেলে রাখছে, ততক্ষণ তাদের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তার মানে এইখানে এই কলকাতা শহরের মধ্যেই ওদের কোনো লুকোনো আস্তানা আছে। সেখানে চোরাই গাড়ির রং পালটানো হয়, নম্বর বদলানো হয়, চেহারা এমনি করে দেওয়া হয় যে তাদের আসল মালিকের নাকের সামনে দিয়ে চলে গেলেও মালিকরা টের পায় না। শুধু তাই নয়, যারা এই চোরাই ব্যাবসার পাণ্ডা তারাও ভোল বদলে এমনি ভালো মানুষ সেজে থাকে যে তাদেরও চেনা যায় না। এখানে ওখানে ভালো ভালো চাকরি-বাকরি করে, গাড়ি হাঁকায়। মাঝে মাঝে ওদের নিজেদের গাড়িও চুরি যাওয়া বিচিত্র নয়। একটা পান দিন তো।'

এই বলে নিতাই সামন্ত খুব হাসতে লাগলেন। তারপর পান খেয়ে আরও বলতে লাগলেন।

—'এবার হয়েছে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। বিনুর দলের টিকটিকিরাও শহরের চারিদিকে চারিয়ে আছে। তাদের টিকিটি চিনবার জো নেই কারো। চোরছ্যাঁচড় ধরবার জন্যে তারা চোরছ্যাঁচড়

সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে! একেবারে ওদের দলের ভেতরে সেঁদিয়ে তারা সমস্ত ব্যাপারটাকে নস্যাৎ করে দেবে!'

মেজোকাকু জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এখানকার আশে-পাশেই কোথাও ওদের ঘাঁটি হয়তো। ওই তো গঙ্গার ঘাটে মালবোঝাই নৌকোর ভিড়। ওই কয়লা আর খড়ের তালের মধ্যে দিব্যি একটা করে আস্ত মোটর গুঁজে পাচার করে দেওয়া যায়। আরে, আমারই যে—' এই অবধি বলে আমার আর গুপির দিকে তাকিয়ে মেজোকাকু চুপ করলেন।

নিতাই সামন্ত তাড়াতাড়ি বললেন, 'এইরকম জায়গাতেই আইনভঙ্গকারীরা থাকে! উঃ, তাদের মধ্যে দিব্যি আছেন, দাদা, জানলায় একটা শিক পর্যন্ত নেই!'

বাবা একটু অপ্রস্তুত হলেন, 'ইয়ে তিনতলার উপর সে-রকম—'

শুনে নিতাই সামন্তর সে কী কাষ্ঠ হাসি! 'ওই আনন্দেই থাকুন, স্যার! আপনার বাড়িটাকে চোরদের সোনার খনি বানিয়ে রাখুন! জানেন, ওরা টিকটিকির মতো দেয়াল বেয়ে ওঠা-নামা করে! ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। আচ্ছা ওই সরকারি ছাপাখানার শেডে ওরা কারা গুলতানি করছে?'

আমি বললাম, 'বড়ো মাস্টারের নাইট স্কুলের ছাত্ররা রবিবার ওখানে মিটিং করে।'

নিতাই সামন্ত তো অবাক! 'তাই নাকি! বাঃ, বেড়ে আছে তো, দিনের বেলায় ছাপাখানায় ভালো মাইনের চাকরি, তেওয়ারির দোকানে চার বেলা পাতপাড়া, 'সন্ধ্যে বেলায় মিটিং আর রাতে—' এই বলে নিতাই সামন্ত উঠে পড়লেন।

মেজোকাকুও উঠলেন, 'চলি রে পানু, নিতাইয়ের আবার নাইট ডিউটি আছে।'

ওঁরা দরজার কাছে যেতেই বাবা গুপিকে বললেন, 'কী রে, তোর বাড়িঘর নেই নাকি? যা, ওদের সঙ্গেই যা।' তারপর দমাস দমাস করে আমার জানলা দুটো বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলেন। হাসি পেল। যে-কেউ ইচ্ছা করলেই পাশের বাড়ির ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে রাস্তা থেকে উঠে এসে, একটা তক্তা ফেলে আমাদের ঘোরানো সিঁড়িতে উঠতে পারে। রাতে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ থাকে বটে, কিন্তু কার্নিশ দিয়ে দু-হাত হাঁটলেই আমাদের পিছনের বারান্দায় ওঠা যায়। তারপর দরজার খড়খড়ির ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে খাবার ঘরের দরজা খুলে ফেলা যায়। রামকানাই নিজে একবার দেরি করে ফেলে, বাইরে বন্ধ হয়ে গিয়ে ওইরকম করে এসেছিল।

পরদিন ভজুদার কাছে কথাটা তুললাম, 'ভজুদা, রাতে রোজ ঠক ঠক শব্দ শুনি।'

ভজুদা চোখ পাকিয়ে বললেন, 'ভূতে বিশ্বাস আছে নাকি?'

—'না না, ভূত না, কিন্তু কিছু হয়তো তৈরি হচ্ছে ওখানে।'

—'কোথায়?'

—'ওই ছাপাখানার পিছনে, নতুন ঠান্ডাঘরে।'

—'ও তো এখনও শেষই হয়নি। সব বিষয়ে যুক্তি দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করবে।'

—'না ভজুদা, ভিতরটা হয়ে গেছে, শুধু সামনের দিকটাই চার বছর ধরে তৈরি হচ্ছে। গুপি বলে—'।

ভজুদা বললেন, 'লেখো, একটা বাঁদর একটা তেলতেলা বাঁশ বেয়ে এক মিনিটে— কী হল?'

—'ভজুদা, বড়ো মাস্টারমশাই নাকি ভূত দেখেছেন। এখানে সব্বাই ভূতের ভয় পায়। সন্ধ্যার পর কেউ ঘাটের গলির দিকে যাবে না। রেলের লাইনে পা দেবে না। রামকানাই বলেছে রাতে ও-লাইনে যেসব গাড়ি আসে, তারা কোনো মালগুদোম থেকে আসে না।'

ভজুদা বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'তাহলে কি বুঝতে হবে যে শুধু মানুষগুলো মলেই ভূত হয় না, রেলগাড়িদেরও ভূত হয়? নাও, চটপট অঙ্কটা টুকে ফেলো। তা ছাড়া একটু হাঁটাচলা করতে অভ্যাস করো এবার। যত সব আজগুবি চিন্তা! ভূতফুত নেই। এক্সারসাইজ করলেই টের পাবে।'

অঙ্ক কষা হয়ে গেলে বললাম, 'আচ্ছা, ভূত না থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে যে কেউ লুকিয়ে স্পেসশিপ বানাবে না, তাই-বা কী করে বলা যায়?'

ভজুদা অবাক হয়ে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'এ বিষয়ে কয়েকটা বৈজ্ঞানিক বই এনে দেব। তাহলেই বুঝবে যে স্পেসশিপ চাট্টিখানিক কথা নয় যে গুদোম ঘরে লুকিয়ে বসে রাতে হাতুড়ি পিটে অমনি বানানো যাবে। আর বড়ো মাস্টার ভূত দেখেছেন না হাতি দেখেছেন। ওসবে কান দিতে হয় না।' ভজুদা চলে গেলে মনে হল কথাটা না তুললেই পারতাম। গুপি বারণ করেছিল।

সব শুনে, পরের রবিবার বড়ো মাস্টার বললেন, 'ভূত নেই বলেছে ভজু? চব্বিশ বছর বয়স না হতেই সব জেনে ফেলেছে নাকি? আমার আটষট্টি বছর বয়স। যতই দিন যায় ততই বুঝি কিছুই জানা হয়নি, আসল জিনিসই সব বাকি আছে। শোন তবে। জয়ন্তিয়া পাহাড়ের নাম শুনেছিস? এখনকার জয়ন্তিয়া কীরকম জানি না, কেঠো পা নিয়ে কোথায়ই-বা যেতে পারি বল? তবু মনে হয় মাঝে মাঝে দুটো পায়ের তলায় যেন জয়ন্তিয়া পাহাড়ের স্প্রিংয়ের মতো ঘাস এখনও টের পাই। মাইলের পর মাইল শুধু ঘাস আর বড়ো বড়ো পাথর। পাথরের যে দিকটাতে রোদ পড়ে না, সেদিকে নরম নরম শ্যাওলা হয়ে থাকে। তাতে শীতের আগে ছোট্ট ছোট্ট হলদে আর গোলাপি ফুল ফোটে, খুদে খুদে ফল ধরে। ঘাসজমির পাশেই হয়তো বাঁশ বন। সে-রকম বাঁশ বন তোরা দেখিসনি। গাঢ় কালচে সবুজ, আমার পায়ের তিনগুণ মোটা গুঁড়ি থেকে সরু হতে হতে ষাট ফুট উঁচুতে উঠে, কচি কলাপাতা রঙের একগুছি পাতা আর কড়ে আঙুলের মতো সরু একটা কুঁড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। গুঁড়ির পায়ে পুরু একটা খাপের মতো জড়ানো। তাতে মিহি রোঁয়া, ছুঁলেই আঙুলে লেগে যায় আর জ্বালা করতে থাকে। তার পাশে দিনরাত ঝর ঝর করে পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে জল পড়ে।

পাহাড়ের উপরে দেবদারুর বন। একবার আমার বন্ধু হরিদাস আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। সবুজ পায়রা শিকার করার ইচ্ছা তার। ওখানকার লোকরা অনেক বারণ করেছিল, ও পাহাড়ে নাকি কেউ চড়ে না; পাহাড়ের 'দেউ' ভারি রাগী; কেউ তাঁর জানোয়ার মারলে তাকে নাকি হাতে-নাতে সাজা দেন। জিনিস বইবার জন্যে পর্যন্ত একটা লোক পাওয়া গেল না। শেষটা নিজেরাই ব্যাগে করে খাবার, জলের বোতল, টোটা আর কাঁধে বন্দুক নিয়ে চললাম। সারাদিন ঘুরে ঘুরে একটা চড়াই পাখি পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। হরিদাসের কী রাগ। এ বনে জানোয়ার গিজগিজ করে, পাহাড়ের তলা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ পায়রা উড়তে দেখা যায়, অথচ একটা কাঠবেড়ালি পর্যন্ত দেখা গেল না। বিরক্ত হয়ে আমাকে বলল, 'তুমি বড়ো খড়মড় করে হাঁট, তারি শব্দে জানোয়ার পালায়। শেষে ক্লান্ত হয়ে বনের মধ্যে ছোটো একটা ঝিলের ধারে বসে খাওয়া-দাওয়া করলাম। তারপর হরিদাস শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। আমার কেমন বুকে ঢিপঢিপ করছিল, চোখে আর ঘুম আসছিল না।

'এখানে বনের গাছগুলো যেন অন্য ধরনের, বড়ো বেশি ঘন, পাতাগুলো বড়ো বেশি বড়ো। হঠাৎ চমকে দেখলাম বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মিলিয়ে আছে অনেক হাতির পা; তাদের মস্ত কান নাড়াও দেখতে পেলাম। তাকিয়ে তাকিয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। জঙ্গলের ভেতরকার অন্ধকারে যেই চোখ সয়ে গেল, দেখি হাজার হাজার জানোয়ারের ভিড়, ছোটো বড়ো

মাঝারি, বাঘ, ভালুক, হরিণ, ভাম, খরগোশ। গাছের ডালে ডালে পাখি। অথচ এতটুকু শব্দ নেই। হাতি দেখেই বন্দুক তুলে নিয়েছিলাম। এবার সেটা হাত থেকে খসে ঝিলের জলে পড়ে গেল। চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। তারি মধ্যে হরিদাস উঠে বসে, পাগলের মতো এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে দেখে, বন্দুক সেইখানেই ফেলে রেখে উলটো দিকে টেনে দৌড়। ওই যে একটু শব্দ, একটু নড়াচড়া, অমনি দেখি চারদিক ভোঁ ভাঁ, কেউ কোথাও নেই। আমার শরীর কাঁপছিল, তবু এক-পা দু-পা করে বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। গাছের নীচে পা দিতেই একটু হাওয়ায় ডালপালা দুলে উঠল আর আমার গায়ে মাথায় টুপটাপ করে সাদা সাদা বড়ো বড়ো ফুল ঝরে পড়তে লাগল। অমনি আমার সব ভয় দূর হল। দেখলাম বনের মধ্যে একেবারে অন্ধকার নয়, গাছের ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত রোদ ঢুকছে। কী জানি মনে হল, দু-মুঠো ফুল কুড়িয়ে, বনের দেউকে মনে করে একটা গাছের গুঁড়িতে ছড়িয়ে দিলাম।

তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। কত হরিণ, কত পাখি, কত সবুজ পায়রা দেখলাম, দিনের শেষে বাসায় ফিরছে। ডেরায় ফিরতেই দেখি হরিদাস তল্পিতল্পা বেঁধে যাবার জন্যে তৈরি। বললে, ''জায়গাটা সত্যি ভালো না!'' সেইদিন-ই ফিরে এলাম।'

মাস্টারমশাই থামলে গুপি বলল, 'এ আবার কীরকম ভূতের গল্প?'

বড়ো মাস্টার হেসে বললেন, 'ভূতের গল্পের আবার এ-রকম সে-রকম হয় নাকি? যেমন দেখেছিলাম, বললাম। তলাপাত্রকে কেমন লাগল?

আমি বললাম, 'ভালো। কিন্তু বাবা বললেন— সোজা তাকায় না কেন? মা বললেন— যাকে-তাকে ঘরে ঢুকতে দিস না। আচ্ছা, মাস্টারমশাই, আমার পা দুটোতে কি কোনো তফাত দেখতে পাচ্ছেন? আমি স্বপ্নে খুব দৌড়োই।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'সে আর এমন কী। আমার নেই-পাটাতে যখন চুলকোয়, তখন কী করে আরাম পাই বল দিকিনি?'

গুপি তখন কথা পালটে বলল, 'জানেন মাস্টারমশাই, মহাকাশযানগুলো যখন অনেক উপরে, অনেক দূরে চলে যায় তখন আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করে না। কোনো জিনিস নীচের দিকে যায় না, সব উপরে উঠতে থাকে। আমার চন্দ্রযাত্রার নতুন বইটাতে আছে যাত্রীরা যদি নানান উপায়ে নিজেদের নীচে আটকিয়ে না রাখে, তাহলে সবাই বেলুনের মতো উড়ে আকাশযানের ছাদের কাছে ঝুলে থাকবে।'

বড়ো মাস্টার মহাকাশযাত্রার কথা শুনলে চটে যান। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'নিশ্বাস ফেলবার বাতাস নিয়ে যেতে হয়-না বোতলে ভরে? যাত্রীরা উড়ে বেড়াবার জায়গা কোথায় পাবে?'

গুপি বলল, 'আমার চন্দ্রযাত্রার বইয়ের লোকরা একরকম আগাছা নিয়ে গেছিল, তারা যাত্রীদের নিশ্বাস-ফেলা কার্বন ডাই-অক্সাইডগুলোকে আবার অক্সিজেন বানিয়ে দিত। ওই আগাছার নাম ডাক-উইড। বোতলে করে কত বাতাস নেবে? আর শুধু চাঁদে গেলেই তো হল না, চাঁদটা খালি একটা টিকিট কাটার স্টেশনের মতো—।'

বড়ো মাস্টার উঠে পড়ে, ঠুক ঠুক করে কাঠের পা ঠুকতে ঠুকতে যেই এক পা পেছু হটেছেন অমনি 'ইঁ'—য়া—য়া—ও' করে সে কী বিকট চিৎকার! তাকিয়ে দেখি কেঠো পা ঠিক পড়েছে নেপোর বেঁড়ে ল্যাজের ডগায়! পাটা তুলতেই এক ঝিলিক বিদ্যুতের মতো নেপো জানলা টপকে ধনে পাতার গাছ মাড়িয়ে কার্নিশ পেরিয়ে, পাশের ফ্ল্যাটের কালো মেমের জানলা গলে হাওয়া!

মাস্টারমশাই কাঁপতে কাঁপতে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। মুখটা একেবারে সাদা, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, ভাঙা গলায় বললেন, 'নেপোর গলা থেকে ওই শব্দ বেরুল! আশ্চর্য! ওকে একটু ধরা যায় না?' আর ধরা! ততক্ষণে মেমের রান্নাঘর থেকে ঝনঝন ক্যাঁও ম্যাও, তারপর সব চুপ।

চার

তার পরের রবিবারে গুপি এসেই বলল, 'একটা মুশকিল হচ্ছে স্পেস-স্টেশনটাকে নিয়ে। ছোটোমামা বলছে নাকি মাধ্যাকর্ষণের এলাকা ছাড়বামাত্র ওটাকে তিন সেকেন্ডে এক বার করে পাক খেতে হবে। নইলে ধপাস করে পড়ে যাবে। তা হলে তো জিনিসপত্র ভেঙেচুরে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি খেয়ে একাকার হবে। মহাকাশযানগুলোই-বা সারানো হবে কী করে?' আমি আঁতকে উঠলাম।

'অ্যাঁ, তাহলে আমাদের বাতাসের বোতলের ব্যাবসার কী হবে? ডাক-উইড দিয়ে যে অক্সিজেন তৈরি হবে তাকে রাখব কীসে?'

গুপি বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই বিদ্যে নিয়ে হয়েছে তোর চন্দ্রযাত্রা! বাতাসের বোতল পাতলা প্লাস্টিকের হবে, তাও জানিস না? কাঁচ তো বেজায় ভারী। কিন্তু মিনিটে কুড়ি বার ঘোরালে বাতাস থেকে মাখন-টাখন না উঠলে বাঁচা যায়। ছোটোমামা এই নিয়ে এত বেশি ভাবছে যে এবারও পরীক্ষায় কী হয় কে জানে।'

ছোটো মাস্টার সেদিন আগেই এসেছিলেন। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ধনে পাতা চিবুচ্ছিলেন আর তেওয়ারির দোকানের বুড়িকে অবাক হয়ে দেখছিলেন। এবার তিনি হঠাৎ পকেট থেকে সবুজ মলাটের একটা বই বের করে বললেন, 'ছোটোমামাকে ভাবতে বারণ কর। বরং পড়াশুনো করুক। এই বইতে লেখা আছে কী করে কলকব্জার সাহায্যে বাইরের খোলটা পাক খাবে, অথচ ভিতরকার জিনিসপত্র শূন্যে ঝুলে থাকবে, এতটুকু নড়বে না। এই দেখ ছবি, এই লোকগুলো সাত ঘণ্টা পাক খেয়েছে, মাখন-টাখন কিচ্ছু ওঠেনি।'

তারপর গুপি আমার দিকে ফিরে বলল, 'ও কী, তোর চোখ লাল কেন?'

রামকানাই মাছের কচুরি এনেছিল। আমার গোল টেবিলে সেগুলোকে নামিয়ে রেখে, ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'লাল হবে না তো কী। দু-দিন ধরে পাতি বেড়ালের শোকে কান্নাকাটি হয়েছে যে!'

তাই শুনে গুপি আর ছোটো মাস্টার দু-জনেই অবাক। সে কী! নেপোর সাংঘাতিক কিছু হয়েছে নাকি? রামকানাই বলল, 'হবে আবার কী! পেয়ারের বেড়াল হাওয়া। আজ তিন দিন সে বাড়ি আসেনি।'

ছোটোমাস্টার বললেন, 'গেল কোথায়?'

শুনে রামকানাইয়ের কী হাসি! 'গেছে কার বাড়ির পাতকুড়ুনি খেতে।'

ভারি রাগ হল। চেঁচিয়ে বললাম, 'মোটেই না। নেপো কারো পাতকুড়ুনি খায় না। বিদ্ঘুটে ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।'

ছোটো মাস্টার বললেন, 'বিদ্ঘুটে আবার কে?'

আমি কিছু বলার আগেই রামকানাই সর্দারি করে বলল, 'ওই যে নটে-কান কেঁদো হুলো তা ছাড়া আবার কে! শুধু কি ডাস্টবিন ঘেঁটে ওর অমন গতর হয়েছে নাকি? গোলগাল বেড়াল দেখলেই

তাকে ভুলিয়ে অন্ধকার গলিতে নিয়ে গিয়ে কপ। নেপো হতভাগাকে পইপই করে মানা করেছি, ওর সঙ্গে মিশিস নে, তা কে কার কথা শোনে। এখন বোঝ ঠ্যালা! কোথায় ঠ্যাং ছড়িয়ে—' রামকানাই চুপ করল।

আমি বললাম, 'এই পাড়া থেকে গত ছয় মাসে একত্রিশটা বেড়াল নিখোঁজ। কালো মেমের হলদে ট্যাবি পর্যন্ত। বিদ্‌ঘুটে কিছু অত বেড়াল খায়নি। আর খায়ই যদি তো আমার নতুন খাতা নিয়ে গেছে কেন?'

ছোটো মাস্টার বললেন, 'নিতাই সামন্তকে বললে হয় না? যে অত চোরাই গাড়ি খুঁজে দেবে, সে একটা সামান্য বেড়াল খুঁজে দিতে পারবে না?'

এ-কথা আমার আগে মনে হয়নি।

গুপি বলল, 'আমার ছোটোমামাকেও বললে হয়, তার খুব বুদ্ধি। সে বলেছে চাঁদে মাটি নিয়ে যেতে হবে। ওখানকার মাটিতে ফসল হবে না। তা ছাড়া কেঁচোও নিয়ে যেতে হবে। তারা তলার মাটি উপরে তোলে। তাহলে বেশি ভারী ভারী ট্রাক্টর নিতে হবে না।'

বড়ো মাস্টার ঠিক সেই সময় এসে ঘরে ঢুকলেন। 'বড়ো দেরি হয়ে গেল, পানু। ওই রাখেশ আর বকু ভূতের ভয়ে আজ কিছুতেই বাড়ি থেকে বেরুবে না! শেষপর্যন্ত নিজে গিয়ে টেনে বের করে আনতে হল। নাকি মোড়ের ওই কোম্পানির আমলের গুদোম বাড়ির দেয়াল থেকে ভূত নামতে অনেকে দেখেছে। সাহেব মেম ভূত। সেজেগুজে, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে চলে যায়, কারো দিকে তাকায় না।'

গুপি বলল, 'কিছু বলে না তো ওরা ভয় পায় কেন?'

বড়ো মাস্টার বললেন, 'সে কথা কে বলে!'

ছোটো মাস্টার বললেন, 'পানুর অমন ভালো বেড়ালটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

—'তাই নাকি? রামকানাইকে দিয়ে পাড়া খোঁজাও। ওই চীনে হোটেলের পেছনে ঠান্ডাঘরের কাঠের সিঁড়িতে রোজ রাতে বেড়ালদের সভা বসে, আমি নিজের চোখে দেখেছি। তাদের মধ্যে নেপো আছে কি না একবার দেখে আসুক।'

রামকানাই ঝুরিভাজা এনেছিল। সে বললে, 'সে কি আর বাকি রেখেছি, মাস্টারবাবু। সিঁড়িতে থিকথিক করছে বেড়াল; কোন সময় হোটেল থেকে চিংড়ি মাছের খোলা বাইরে পড়ে সেই আশাতেই বসে আছে। কিন্তু তার মধ্যে নেপো নেই। তিনি কাঁটা কি খোলা খান না। পানুদাদা মাছ বেছে দিলে তবে তিনি মুখে তোলেন।'

বড়ো মাস্টার চেয়ারে বসে বললেন, 'খায় না আবার! তেমন অবস্থায় পড়লে, না খায় এমন জিনিস থাকে না। একবার আমরা বড়ো বোট নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের ছোটো ছোটো দ্বীপে গুয়ানো খুঁজছিলাম। সমুদ্রের পাখিদের ময়লা জমে থাকে, তাকেই গুয়ানো বলে, বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়।

'একটা ছোট্ট দ্বীপে উঠছি, সমুদ্রের তীরে অনেকটা বালি, দ্বীপটা কিন্তু পাথরে তৈরি, ওপরটা চ্যাপটা। পাথরের খাঁজে খাঁজে যেখানে মাটি একটু পুরু, সেখানেই বেঁটে বেঁটে গাছপালা, ঝরনাও আছে নিশ্চয়। ভাবলাম এখানে নোঙর করে দু-দিন বিশ্রাম করা যাবে। দেখে মনে হল মাছের আর পাখির ডিমের অভাব হবে না। নৌকোর ক্যাপ্টেন আর আমি আর আমার পোষা বেড়াল 'ম্যাও' আগে নামলাম। আমরা দেখে এলে অন্যেরা নামবে।

'তবে অনেকেরই খুব রাগ, ম্যাও নামছে অথচ তাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে? যাই হোক, আমরা বালি পেরিয়ে হাঁচড়পাঁচড় করে দ্বীপের পাথুরে গা বেয়ে উঠতে লাগলাম। দেখতে দেখতে নৌকো আমাদের চোখের আড়াল হয়ে গেল।

'আগে আগে ক্যাপ্টেন, তারপর আমি, আমার কাঁধে ম্যাও বসে। ক্যাপ্টেন বলল, "দ্বীপটা যেন একটু অদ্ভুত ঠেকছে। পাখির ডাক নেই কেন?" সত্যি, এমন চুপচাপ দ্বীপ কখনো দেখিনি। সমুদ্রের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যায় না। গুয়ানো ছেড়ে দিলাম, একটা জন্তুজানোয়ার বা পাখি, কিছু দেখতে পেলাম না। তার উপর ম্যাও ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে কেবলি রেগে গর-গর করতে লাগল।

'যাকে গাছগাছড়া ভেবেছিলাম তাও দেখলাম কাঁটাঝোপ ছাড়া কিছু নয়। অনেক খুঁজে ছোট্ট একটা ঝরনা পেলাম। আর একটু রোদ উঠলে কী সাংঘাতিক গরম হবে ভেবে তাড়াতাড়ি পাথর বেয়ে নামতে লাগলাম। ওই ন্যাড়া পাথর তেতে উঠলেই হয়েছে আর কী! খানিকটা পথ বাকি থাকতে অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সমুদ্রের তীর চাঁছাপোঁছা, দূরে জলের উপর একটা কালো দাগ ক্রমে ছোটো হতে হতে শেষটা মিলিয়ে গেল। নাবিকদের নামতে দেওয়া হয়নি বলে তারা রেগেমেগে আমাদের ফেলে চলে গেছে।

'হতাশ হয়ে যেখানে ছিলাম, বসে পড়লাম। অমনি ম্যাও এক লাফে আমার ঘাড় থেকে নেমে, রেগে তিনগুণ বড়ো হয়ে গর-র করতে লাগল। দেখি পাশেই একটা গুহার মুখ।

'রোদ থেকে আশ্রয়ের আশায় ঢুকে পড়লাম তার ভিতর। খানিকদূর গিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে এখানে ওখানে জোড়া জোড়া চোখ জ্বলছে। টর্চের আলো ফেলে দেখি পাথরের থাকে থাকে বেড়াল। কালো, হলদে, সাদা, ছাই, পাটকিলে। বোধ হয় ম্যাওকে দেখেই, তারা সব উঠে দাঁড়িয়ে, চার পা এক জায়গায় জড়ো করে, পিঠ কুলোর মতো বাঁকিয়ে, পাথরের উপর নখ ঘষতে লাগল। তার খড়খড় শব্দে আমাদের গায়ে কাঁটা দিল। ম্যাও একেবারে কাঠ!

'কোনোমতে হোঁচট খেতে খেতে পড়িমরি করে গুহা থেকে বেরিয়ে বাঁচলাম। অবাক হয়ে দেখি আমাদের নৌকো আবার ফিরে আসছে। আমরা নীচে পৌঁছোবার আগেই ম্যাও গিয়ে নৌকোয় উঠে পাটাতনের তলায় গুটিসুটি হয়ে বসে পড়ল। বেড়ালের খাদ্যের কথাই যদি বল, ওই দ্বীপে তারা খেত কী? পাখি নেই, প্রাণী নেই, গাছপালা নেই। হয়তো পরস্পরকেই—'

ছোটো মাস্টার বললেন, 'না, না, নিশ্চয় সমুদ্রের মাছ ধরে খেত। ঢেউয়ের সঙ্গে যেসব ঝিনুক, শামুক, তারামাছ, সমুদ্রের ঘোড়া, জেলিফিস এসে বালির উপর পড়ে, তাও খেত।'

বড়ো মাস্টার বললেন, 'পরে শুনেছিলাম, এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের দুটো বেড়াল ছিল। তাদের উৎপাতে টেকা দায় হয়ে উঠেছিল বলে নাবিকরা লুকিয়ে ওদের ওখানে ফেলে দিয়ে গেছিল। ওরা নাকি টিনের মাছ ছাড়া কিছু খেত না। এদিকে নাবিকরা শুকনো মাংস পেত। ওইসব বেড়াল নিশ্চয় তাদেরই বংশধর।'

ঠিক এই সময় ঠান্ডাঘরের দিক থেকে খুব জোরে কতগুলো ঠক-ঠক শব্দ, তার পরেই এমনি ঝন্‌ঝন্ যে কান ঝালপালা হয়ে গেল। বড়ো মাস্টার ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। কী জানি ওঁর বাড়িতেই কিছু হল না তো। পঙ্গু বউ একলা আছে।

ছোটো মাস্টার বললেন, 'বরফ ফাটলে ওইরকম শব্দ হয়। রাখেশ আর তার বন্ধুরা বলছিল যে ঘর এত বেশি ঠান্ডা করে ফেলেছে যে কয়েকটা পেঙ্গুইন পাখি দেখা দিয়েছে।'

গুপি বলল, 'ওরা তো ভূতও দেখে।'

সেদিন সবাই একটু তাড়াতাড়ি চলে গেল। রামকানাই ঘরে এসে বলল, 'তিনজনে এসে পঁচিশটা কচুরি সাঁটাল, অথচ বেড়ালের একটা গতি করতে পারল না। আমার কিন্তু বুড়ি মেমকেই সন্দেহ হয়।'

আমি বললাম, 'ওর বেড়াল-ও তো গেছে। তুমি সবাইকে সন্দেহ কর।'

—'সবাইকে সন্দেহ না করেই-বা করি কী। তুমি তো তেওয়ারির দুঃখে গলে যাও। আহা, বেচারা, রোদে-বৃষ্টিতে চাটাইয়ের ছাউনির নীচে বসে চা জলখাবার তৈরি করে আর বিক্রি করে। রাতে শোবার একলা ভালো জায়গা পায় না, হেনা তেনা কত কী বল। জান, ওই চারতলা ঠান্ডা ঘরটির মালিক কে? ওই তেওয়ারি ছাড়া আর কেউ নয়। তোমার বাবাকে তেওয়ারি কিনে ফেলতে পারে, তা জান?'

ভীষণ রেগে গিয়ে গড়বড় করে গাড়িটা চালিয়ে জানলার কাছে গেলাম। দেখলাম বুড়ি ভিকিরি তেওয়ারির সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়া করছে। রামকানাই-ও জানলার ধারে এসে বলল, 'ওই আরেক জন। আমার হাতে দিয়ে ওর জন্যে কত পয়সাই-না পাঠিয়েছ তুমি। তোমার মার কাছ থেকে চেয়ে খদ্দরের চাদর পর্যন্ত ওকে দিয়ে আসতে হয়েছে। আর তেওয়ারি তো প্রত্যেক দিন সন্ধ্যে বেলায় দোকান বন্ধ করার আগে, শালপাতার ঠোঙা ভরে ওকে ঝড়তিপড়তি খাবার দেয়। তাই নিয়েই আবার ঝগড়া করে বুড়ি। আর ওই যে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে অনেক রাতে একটা বুড়ো ভিক্ষে করে, চোখে দেখে না। মুখে কথা নেই, শুধু হাতটা পেতে দেয়। ওকে দেখে সকলের দয়া হয়, সবাই পয়সা দেয়। দু-জনার তফাতটা দেখেছ তো?'

আমি বললাম, 'তা দেখেছি। তাই বলে ঝগড়াটি বুড়িকে চাদর দেব না কেন? ওর-ও তো ঠান্ডা লাগে।'

রামকানাই বলল, তা লাগে বই কী। 'তা ছাড়া ঝগড়াটে বুড়ি আর ভালোমানুষ বুড়ো এক-ই লোক।'

পাঁচ

শুনে আমি হাঁ। তাকিয়ে দেখি বুড়ি তেওয়ারির নিজের ভাগ থেকে আরো দুটো পুরি নিয়ে, ঝগড়া শেষ করে, খাবারগুলোকে কোঁচড়ে বেঁধে, তরতর করে ঠান্ডাঘরের বাঁশের ভারা বেয়ে উপরে উঠে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল! ভারায় চড়ার আগে এক বার চারদিকে চেয়ে দেখল। মুখের উপর রাস্তার আলো এসে পড়ল। অবাক হয়ে দেখলাম রামকানাই ঠিকই বলেছে। মোড়ের মাথার বুড়োর আর ঝগড়াটি বুড়ির মুখ অবিকল এক।

বললাম, 'রামকানাইদা, ওরা তো যমজও হতে পারে।'

রামকানাই কাষ্ঠ হেসে বলল, 'তাহলে দু-জনকে একসঙ্গে দেখা যায় না কেন? না পানুদা, পৃথিবীতে কাকেও বিশ্বাস হয় না। বিশেষ করে তোমাদের নতুন বন্ধু ওই ছোটো মাস্টারটিকে তো নয়ই। এদিকে তলাপাত্র বলতে বুড়ো মাস্টার অজ্ঞান! ওঁর কপালে দুঃখ আছে বলে রাখলাম।'

এই বলে রামকানাই দরজা খুলে দিতে গেল। বাবা-মা নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে আবার কাকু আর নিতাই সামন্তও এসেছিলেন। নিতাই সামন্তকে আজকাল এই পাড়ায় রাতে ডিউটি দিতে হয়, তাই এক পেয়ালা গরম চা না হলে চলে না। এক পেয়ালা মানেই দুই পেয়ালা আর গোটা দুই পান।

আমি গাড়ি চালিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। খালি বিনু তালুকদারের অদ্ভুত বুদ্ধির গল্প। বিনু তালুকদারের চেহারা নাকি দিল্লির দু-একজন বড়ো কর্তা ছাড়া, কেউ দেখেনি। তার টিকটিকিদেরও কেউ চেনে না। এখানকার পুলিস বিভাগের কেউ তো নয়ই। নিতাই সামন্ত এক টিপ চুন দাঁতে লাগিয়ে বললেন, 'কে জানে মশাই, ওই যে-লোকটাকে সন্দেহ করে আজ এই রাতের অন্ধকারে, ভূতের গলিতে যাচ্ছি, সে-ই হয়তো বিনু তালুকদারের গুপ্ত গোয়েন্দা, ছদ্মবেশে বেড়াচ্ছে। আমার অবিশ্যি ভূতের ভয় নেই। কারণ প্রথমত ভূত আছে বলেই বিশ্বাস করি না। দ্বিতীয়ত আমার হাতে গুরুদেবের দেওয়া অব্যর্থ মাদুলি বাঁধা আছে। ভূতে আমার কিছু করতে পারবে না।'

নিতাই সামন্ত চলে গেলে পর বাবা বললেন, 'ওই গুপিটার পাল্লায় পড়ে তুই-ও যেন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে শুধু চাঁদে যাবার জোগাড়যন্ত্র করিস না। চাঁদে গেলেই হল আর কী!'

আমি বললাম, 'না, বাবা, শুধু চাঁদে যাওয়া নয়, চাঁদ থেকে আরও দূরে যাওয়া হবে। ওটা হল প্রথম স্টেশন, ওখানেই নাকি টিকিট কাটতে হবে, গুপির ছোটোমামা বলেছেন।'

শুনে বাবা তো হেসেই কুটোপাটি। 'আর ছোটোমামা! আরে তোদের গুপির ছোটোমামা তো ফেরারি আসামি! একবাক্স স্ক্রু-ট্রু নিয়ে হাওয়া। লিখে রেখে গেছে যে সামান্য বি.এস্‌সি. পাস করে তার কিছু হবে না। সে চাঁদে যাওয়ার চেষ্টায় আছে।'

আমার কান্না পেল। 'তাহলে গুপিকে আমাকে না নিয়েই ছোটোমামা চাঁদে চলে গেলেন নাকি? জমি-টমি কিনে রেখেছেন বোধ হয়, কিন্তু—'

বাবা এত বেশি হাসতে লাগলেন যে থামতে হল। বাবা বললেন, 'না, না, অত ভাবনার কারণ নেই। চোঁয়াঢেকুর ওঠাতে সে আবার ফিরে এসেছে।'

সঙ্গেসঙ্গে আবার সেই ঝনঝন শব্দ। আমি বললাম, 'বরফ ফাটছে। ওখানে পেঙ্গুইন গজিয়েছে।'

বাবা এমনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে হাসি থেমে গেল। আমি যদি হাঁটতে পারতাম, একদিনও বাড়িতে থাকতাম না।

আরও সাত দিন কেটে গেল, নেপোর কোনো পাত্তা নেই। মেজোকাকু বললেন, 'একটা পার্সিয়ান ক্যাট এনে দিই, কী বলিস? বাড়ি ছেড়ে এক পা নড়বে না, এই বড়ো সাইজের, ছাই রঙের গা, নীল চোখ। বেড়ালকে বেড়াল, কুকুরকে কুকুর। পাতি বেড়াল কেউ পোষে নাকি?'

খুব দুঃখ হল। বললাম, 'কেন পুষবে না? আমাদের এই বাড়িতে আটটা ফ্ল্যাট, প্রত্যেকের একটা করে বেড়াল ছিল। এখন অবিশ্যি সবার নেই। তিন নম্বর, চার নম্বর আর সাত নম্বরের বেড়ালও অদৃশ্য হয়ে গেছিল, তবে তারা ফিরে এসেছে। বিদঘুটে তাদের খায়নি, রামকানাই যাই বলুক-না কেন।'

ছোটো মাস্টার বললেন, 'এ তো ভারি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আপনার বন্ধু নিতাই সামন্ত এই নিয়ে একটু তদন্ত করলে পারেন।'

মেজোকাকু চটে গেলেন, 'রেখে দিন ওসব বাজে কথা। সে এখন নিজের কাজ ফেলে বেড়ালের পিছন ঘুরুক আর কী!'

বড়ো মাস্টারমশাই না থাকলে ছোটো মাস্টারের বেজায় সাহস বেড়ে যায়। তিনি বললেন, 'আহা, এমনও তো হতে পারে যে গাড়ি চুরি আর বেড়াল চুরি দুটো আলাদা ব্যাপার নয়?'

মেজোকাকু অবাক হয়ে ছোটো মাস্টারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঠিক সেই সময় বড়ো মাস্টার এসে ঢুকলেন। মেজোকাকু তাঁকে তলাপাত্রের মন্তব্যটা বলে খুব হাসতে লাগলেন।

বড়ো মাস্টারমশাই বেশ গম্ভীর মুখেই বললেন, 'তাহলে বুঝতে হবে কি যে এখনও নেপোকে পাওয়া যায়নি আর তলাপাত্রের মতে চোরাই গাড়ি আর হারানো বিল্লি একসঙ্গে পাওয়া যাবে? তা কিন্তু কিছুই বলা যায় না। হয়তো চোরাই গাড়ির গোপন কারখানায় ইঁদুরের উপদ্রবে টেকা যাচ্ছিল না বলে ওরা বেড়াল আমদানি করছে। কী বলো তলাপাত্র?'

তলাপত্র লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে চুপ করে রইল। বড়ো মাস্টার বললেন, 'তা হলে শোনো। বর্মায় একবার দেখা গেল যখনি—'

এইটুকু বলেছেন, এমনি সময় হন্তদন্ত হয়ে গুপি এসে উপস্থিত। তার চোখমুখ দেখে বুঝতে পারলাম। একটা কিছু হয়েছে। সে ভীষণ উত্তেজিতভাবে বলল, 'ছোটো মাস্টারমশাই, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। এক্ষুনি দেখলাম দু-তিনজন লোক জালে জড়িয়ে ছোটো ছোটো জ্যান্ত মাছ নিয়ে ঠান্ডাঘরের গলিতে ঢুকল। ওখানে যে পেঙ্গুইন গজিয়েছে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।'

বড়ো মাস্টার অবাক হয়ে বললেন, 'কী বলেছে তলাপাত্র? ঠান্ডাঘরে পেঙ্গুইন গজিয়েছে? মাছ গজায়নি?'

তলাপাত্র আস্তে আস্তে বললেন, 'না স্যার, জল ছাড়া মাছ বাঁচবে কী করে?'

বড়ো মাস্টার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাবা-মা ফিরে এলেন। 'আরে গুপি, তুই এখানে? এদিকে যে তোর ছোটোমামাটি এবার সত্যি ফেরারি হয়ে গেছে সে খবর রাখিস?'

বাবা খুব হাসতে লাগলেন। কিন্তু আমাদের হাত-পা জমে বরফ। ছোটোমামা ফেরারি হলে আমাদের চাঁদে যাওয়ার কী হবে? বাবা একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'সে এক কাণ্ড, মশাই। বইয়ের সঙ্গে চাঁদু ছোকরার সম্বন্ধ নেই, খালি অলিগলিতে ঘুরবে আর যত রাজ্যের রাবিশ কিনে আনবে। যত সব মলাট-ছেঁড়া বাজে বই আর জংধরা লোহার টুকরো। নিজের ঘরটাকে ছাদ অবধি বোঝাই করে ফেলছে। তারপর কাল একেবারে বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি! বাছাধন বাজারের থলি বোঝাই পেরেক শেকল ইত্যাদি নিয়ে বাড়িতে ঢুকছেন। তাও সোজা পথে না, জলের পাইপ বেয়ে। আর পেছন থেকে বেল্ট খামচে ধরেছেন প্রাণেশবাবু!'

বড়োমাস্টার বললেন, 'তিনি কে?'

—'কে আবার, ছোটোমামার বাবা, অর্থাৎ গুপির দাদু! বুড়ো তো চটে কাঁই। হতভাগা কিছুতেই পড়বে না! পাছে পালায় তাই ঘরের শেকল তুলে দিয়েছিলেন, জানলা দিয়ে বেরিয়ে পাইপ বেয়ে পালাল!!— ছেলের হাত থেকে থলি পড়ে পেরেক ছড়িয়ে একাকার। তাই দেখে বুড়োর হাতও হয়তো একটু ঢিলে হয়েছিল, অমনি হ্যাঁচকা টানে বেল্ট ছিঁড়ে ছোকরা পগার পার! সারা রাত সারা দিন গেছে ছেলের দেখা নেই। ও-বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। তুই বলতে চাস, তুই কিছু জানিস না, গুপি?'

গুপি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলল, 'আমি কী করে জানব? আমরা থাকি হেদোর কাছে— আর দাদুরা বাদুড়বাগানে। যাই, অনেকগুলো হোমটাস্ক করতে হবে।' এই বলে দৌড়।

গুপি চলে গেলে বাবা বললেন, 'ওই দুষ্টু মামা আর তার এমন ভালো ভাগনে! গুপির মতো হতে চেষ্টা করিস পানু।' তারপর মেজোকাকুকে বললেন, 'আসল কথাই বলতে ভুলে গেলাম। চাঁদুর ঘর সার্চ করা হয়েছে, যদি কোথায় গেল তার কোনো ক্লু পাওয়া যায়। লোহার স্তূপের নীচে থেকে দুটো ভাঙা মোটর গাড়ির নম্বর প্লেট পাওয়া গেছে। দুটোই চোরাই মোটরের নম্বর প্লেট।'

মেজোকাকু বললেন, 'সে কী! কী করে জানলে?'

—'আরে, চাঁদুর মা এমন কান্নাকাটি লাগিয়ে দিয়েছেন যে শেষপর্যন্ত বুড়ো থানায় গিয়ে ছেলে হারানো ডাইরি করে এলেন। সেখানে সবাই হেসেই কুটোপাটি, হারিয়েছে আবার কী, পেলিয়েছে বলুন। ওইখানেই তোর বন্ধু নিতাই সামন্তর সঙ্গে দেখা। সে-ই ঘর সার্চ করে নম্বর প্লেট বের করেছে আর ফর্দ মিলিয়ে দেখেছে দুটোই হারানো গাড়ির নম্বর প্লেট। কাজেই চাঁদুর পেছনে এবার হুলিয়া লেগেছে। শুধু যে ঘর-পালানো ছেলে তা তো নয়, একেবারে ফেরারি আসামি। ধরা পড়লেই হাতে হাতকড়া।'

শুনে সবাই থ। বাবা একটু হেসে, উঠে গেলেন। তখন আমি বললাম, 'তা হতে পারে না। আমরা চাঁদে যাব বলে ছোটোমামা স্পেসশিপ বানাবেন, তাই পেরেক-টেরেক জমা করছেন। ওসব জিনিস উনি নিজের টিপিনের পয়সা দিয়ে সের দরে কেনেন। কোথা থেকে ওগুলো কিনেছেন বের করতে পারলেই গাড়িচোরও বেরিয়ে পড়বে।'

মেজোকাকু বললেন, 'তাহলে কোথা থেকে কিনেছে সেটা জানা দরকার। অর্থাৎ ওকে ধরা দরকার। যাই, দেখি নিতাই কী বলে।'

মেজোকাকু চলে গেলে বড়ো মাস্টারমশাই বললেন, 'ও কী পানু, অত মনমরা কেন? ওই ছেলেকে ধরবে নিতাই সামন্তরা? তাহলেই হয়েছে! ওদের ও এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচে আসতে পারে। তোমাদের চাঁদে যাওয়ার কোনো অসুবিধাই হবে না। অবিশ্যি চাঁদে যাওয়াটা আমি কোনোদিনই সমর্থন করব না। তা ছাড়া পায়ের এক্সারসাইজগুলো করছ তো? নইলে চাঁদে যাবেই-বা কী করে? কী বললে তলাপাত্র, মুখ তুলে কথা বল না কেন? তোমাকে তো আর আমি খেয়ে ফেলব না!'

ছোটো মাস্টারমশাই ভয়ে ভয়ে বললেন, 'ওই যে বর্মার গল্পটা—'

—'কোনটা? ওই ফুঙিদের মাছের গল্পটা?'

—'না, না, ওই যে যখনই কী হয় তখনই আরেকটা কী হয়—'

বড়ো মাস্টার খুব হাসলেন, 'ও সেইটে। বুঝলে পানু, বি.এ. পাস করিয়ে, বাবা আমাকে কিছুদিন রেঙ্গুনে রেখেছিলেন। ওখানে আমাদের একটা আপিস ছিল। আপিসটা দেখতে ছোটো, একটা এত সরু গলির মধ্যে যে তার ভিতর মোটর গাড়ি ঢুকত না। কিন্তু সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার আমদানি-রপ্তানি কারবার হত। লোক গিজগিজ করত গলিটিতে। একদিনে এত কোটি কোটি টাকার লেন-দেন বর্মায় আর কোথাও হত না। আমাদের থাকার জায়গা ছিল ওপর তলায়। পাশাপাশি দু-টি বেশ বড়ো ঘর, রান্নাঘর, স্নানের ঘর। তা তোমাদের বউঠান কিছুতেই একা বেরুবে না, সবটাতেই তার বেজায় সন্দেহ। বুঝলাম লোক রাখতেই হবে, এবং যত পুরোনো লোক হয় ততই ভালো। দুঃখের বিষয়, লোকরা যেই একটু পুরোনো হয়, রাঁধাবাড়ায় হাত পাকায়, অমনি বলা নেই কওয়া নেই কোথায় উধাও হয়। তারপর কিছুদিন ভারি অসুবিধা, লোক পাওয়া যায় না! তোমাদের বউঠান রাঁধে খাসা, কিন্তু হাটবাজার আমাকে করতে হত। এদিকে কাজের এতটুকু ক্ষতি হলেই, বাবা হয়তো রেগে-মেগে ত্যাজ্যপুত্র করে দেবেন।

'এবাড়ি-ওবাড়ি জিজ্ঞাসা করে টের পেলাম, শুধু আমাদের বাড়িতে নয়, সব বাড়ির ওই এক অবস্থা। মাস তিনেক ওইভাবে চলে, তারপর আস্তে আস্তে আবার লোক পাওয়া যায়। ভাবলাম এ-দেশের ওই রকমই ব্যাপার, এরা ছয় মাস কাজ করে তো তিন মাস দেশে বসে খায়।

'দু-বছর এইভাবে চলল, তারপর সালওয়েন নদীতে মানপু বলে একটা ছোটো জায়গায় যেতে হল। একাই গেলাম, পরিবার নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়, বেজায় ডাকাতের উপদ্রব। পৃথিবীতে

যেখানেই যাওয়া যাক-না কেন, একটা-না-একটা ঝামেলা থাকে। ওইখানে আমাদের কাঠগুদোম ছিল, বন্দুকধারী পাহারাওয়ালা রাখতে হত, নিজেদেরও যথাসম্ভব সতর্ক থাকতে হত। ডাকাতির ঢেউ আসত। মাস তিনেক খুব ডাকাতি, তারপর ছয় মাস সব চুপচাপ। তারপর আবার ডাকাতি। আমরাও তাই বুঝে কাজ গুছিয়ে নিতাম, ওই ছয় মাসের মধ্যে টাকাকড়ির লেন-দেন সেরে ফেলতে চেষ্টা করতাম। রেঙ্গুনের চাকর পালানোর আর মানপুর ডাকাতির কোনো সম্বন্ধ আছে কেউ সন্দেহও করতাম না। বছর পাঁচেক বাদে রেঙ্গুনে একজনদের চাকর হঠাৎ মারা গেলে, তার জিনিসপত্রের মধ্যে এমন সব চোরাইমাল বেরুল যাতে আর কোনো সন্দেহই রইল না যে যারা ছয় মাস ভালোমানুষ সেজে রেঙ্গুনে লোকের বাড়িতে কাজ করত, তারাই মানপুতে তিন মাস দুর্ধর্ষ ডাকাতি করত। কাজেই কীসের সঙ্গে কীসের সম্বন্ধ আছে কিছুই বলা যায় না। চলো হে তলাপাত্র, তোমাকে ভূতের গলিটা পার করে দিয়ে আসি।'

ওঁরা চলে যাবার আধ ঘণ্টা পরে রামকানাই আমার জন্যে হরলিক্স নিয়ে এল। মুচকি হাসতে হাসতে বলল, 'যত সব বিদ্যেদিগ্‌গজ হয়েছেন।'

আমি বললাম, 'কী যে বল, রামকানাই, বড়ো মাস্টার কত দেশ ঘুরেছেন, কতরকম দেখেছেন।'

রামকানাই বলল, 'মুখে যত বউয়ের উপর দয়া, আর ওদিকে একবার তাকিয়ে দেখো-না। দু-মুখো সাপ। আজ আমি কিন্তু রাতে তোমার ঘরে শোব না, যাত্রা দেখতে যাব। ভয় করে তো বুড়ো মাস্টারকে ডাকতে পার।' বড়ো মাস্টারমশাইকে ভক্তি করি বলে রামকানাইয়ের যত রাগ।

তবু ওঁদের জানলার দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। এত দূর থেকে কথা শোনা যায় না, শুধু ছায়ার মতো দেখা যায়। মনে হল বকবার আঙুল তুলে মাস্টারমশাই বউকে শাসাচ্ছেন। বড়ো কষ্ট হল।

সে-রাতে আর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বার বার উঠে বসে জানলা দিয়ে দেখছিলাম, বড়ো মাস্টারমশাইয়ের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে আর বড়ো মাস্টারমশাই ঘরময় অস্থিরভাবে পাইচারি করছেন। একবার তন্দ্রামতো এসেছিল, চমকে জেগে উঠলাম। কে ঠোঁট চেপে শিস দিচ্ছে 'শ্‌ শ্‌ ট্‌ শ্‌ শ্‌ ট্‌'। এ তো গুপির আর আমার গোপন সংকেত। এত রাতে গুপি কী করে এল? হাতে ভর দিয়ে এক লাফে গাড়িটাতে চড়ে জানলার কাছে গিয়ে দেখি যা ভেবেছি ঠিক তাই। গুপি ছাপাখানার ঘোরানো সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, কাঁধে একটা তক্তা। আমি ইশারা করে ডাকতেই তক্তাটা যথাস্থানে ফেলে স্বচ্ছন্দে ফাঁকটুকু পার হয়ে আমাদের ঘোরানো সিঁড়িতে এসে উঠল। বাবা! ওই তিন তলার উপরে সরু তক্তার উপর দিয়ে ওকে হাঁটতে দেখে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ! আমাদের সিঁড়িতে উঠে আবার ঝুঁকে তক্তাটাতে টান দিল। দেখি এ মাথাটা আমাদের রেলিংএর সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে। ওইখানেই তক্তাটা ঝুলতে লাগল।

আমার শোবার ঘরের পাশেই খাবার ঘর, তার বাইরে সরু বারান্দা। কার্নিশ বেয়ে দুই হাত হেঁটে সেই বারান্দায় উঠতে গুপির পাঁচ মিনিটও লাগল না। আমি খাবার ঘরের দরজার নীচু ছিটকিনিটা খুলে দিলাম। গুপি ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রেখে আস্তে আস্তে আমার ঘরে এল। খাবার ঘরের পর বসবার ঘর, তার ওপাশে মা-দের ঘর।

তবু আমার দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। গুপি বলল, 'বাড়িতে বলে এসেছি তোর এখানে খাব শোব।'

—'খাবার কোথায় পাব? ডুলিতে পাঁউরুটি থাকতে পারে।'

—'আরে দূর, ছোটোমামার কাছে খেয়ে এলাম এক্ষুনি। পরোটা কাবাব ক্ষীরের সন্দেশ।'

এমনি চমকে গেলাম যে জিব কামড়ে ফেললাম। গুপি বলল, 'এসব কথা কাউকে বলবি না। ছাপাখানার ওই যে ঘোরানো সিঁড়ির মাথায় দরজা দেখছিস, ওটা ছোটোমামার ঘর। ছোটোমামা ছাপাখানার বদলি নাইট ওয়াচম্যানের চাকরি পেয়েছে।' এই বলে গুপি মুখ চেপে বেজায় হাসতে লাগল। 'সবাই জানে ও আগের পাহারাওয়ালার ছোটো ভাই।'

একটু পরেই আমার আরাম কেদারায় কুশন মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ে গুপি বলল, 'দাড়ি পরে কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে সে আর কী বলব। নকল দাড়ির নীচে সত্যি দাড়ি গজাচ্ছে। এই দু-দিনেই চমৎকার খোঁচা খোঁচা বেরিয়েছে। কিন্তু ভুলে যাস না যে ওর প্রাণ তোর হাতে।' এই বলেই পাশ ফিরে গুপি দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমারও গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল! আমাকেও গুপির আর ছোটোমামার উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে। আস্তে আস্তে পা-দুটোকে গুটোতে চেষ্টা করতে লাগলাম। আশ্চর্য হয়ে টের পেলাম, অন্য দিন কিছু হয় না, আজ কিন্তু পায়ের গুলিটাকে বেশ শক্ত করতে পারছি।

শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, কাল সকালে গুপিকে দেখে মা কী বলবেন। নিশ্চয় জানতে চাইবেন কোথা দিয়ে এসেছে! ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি সাতটা বেজেছে, রামকানাই আমার হরলিক্স এনেছে, গুপির কোনো চিহ্ন নেই। পরে জানলার কাছে গিয়ে দেখি তক্তাটাও নেই! তবে স্বপ্ন যে নয়, তার প্রমাণ গুপি তার ছেঁড়া চটি ফেলে, আমার আস্ত চটি পরে চলে গেছে। যাক গে, আমার চটিই-বা কী, আর জুতোই-বা কী! আমি তো দু-পায়ে ল্যাংড়া। একথা ভেবে বেজায় কান্না পাচ্ছিল। ভাগ্যিস রামকানাই ঠিক সেই সময় গরম গরম তিনকোনা পরোটা আর কাল রাতের বাকি দুটো মাংসের আলুচপ এনে হাজির করল, তাই মনটা আবার ভালো হয়ে গেল।

ছয়

আজকাল ছোটো মাস্টারও রোজ আসেন। ডাক্তারবাবু বাবাকে বলেছেন যে আমাকে নানারকম ভালো হাতের কাজ শেখালে মনটন ভালো থাকবে, তাহলে ঠ্যাং দুটোও তাড়াতাড়ি সারবে। নাকি রোগটা ঠ্যাঙের নয়, মনের। মনের জোর হলেই পায়ের জোর হবে। কিছু বললাম না, কারণ হাতের কাজ শিখতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

আপত্তি তো নেই-ই, বরং আগ্রহ আছে বলা যায়। বড়ো মাস্টার বাবাকে বললেন, 'তলাপাত্র যন্ত্রপাতি গাড়ি ইত্যাদির ছোটো ছোটো মডেল তৈরি করতে ওস্তাদ। আমাদের নাইট স্কুলের বড়ো ছেলেদের দিয়ে রেলগাড়ি আর এঞ্জিনের যে খাসা মডেল করিয়েছে, দেখলে অবাক হয়ে যাবেন।'

বাবাকে দেখাবার জন্যে মডেলটা আনলেনও বড়ো মাস্টার। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অবিকল একটা রেলগাড়ি। দরজা, জানলা, স্প্রিং, চাকা, আলো, পাখা, জলের ট্যাঙ্ক, লাইন, ব্রেক, অ্যালার্ম সিগ্‌নেল, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের যাবতীয় কিছু, একেবারে হুবহু সত্যিকার গাড়িতে যেমন থাকে। রং টং দিয়ে তৈরি। আমার ঘরের মেঝেতে লাইন বসিয়ে, প্লাগ লাগিয়ে সেই গাড়ি চালানো হল। তার বাঁশিটি পর্যন্ত অবিকল। কী বলব, গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

সেদিন রাতে মা-বাবার মুখে ছোটো মাস্টারের প্রশংসা আর ধরে না। এতদিন চোর চোর চেহারা, সোজা তাকায় না কেন, ইত্যাদি কী না বলেছেন সবাই। আজ একেবারে উলটো কথা। তখনই ঠিক হয়ে গেল ছোটো মাস্টার রোজ বিকেলে নাইট স্কুলে যাবার আগে, আমাকে ঘণ্টা দুই হাতের কাজ শেখাবেন। ভালোই হল; ওই সময়টাই আমার ভালো কাটত না। আগে ওই সময়টা খেলার মাঠে

কাটত। রোজ চারটে থেকে ছ-টা যদি মডেল তৈরি করা যায়, বিশেষত ছোটো মাস্টারের সঙ্গে, তাহলে মন্দ কী। তা ছাড়া আমার আরেকটা মতলবও আছে।

প্রথম দিন ছোটো মাস্টার এসে কিছু বলবার আগেই আমি বললাম, 'স্পেসশিপের মডেল করা যায়-না?'

ছোটো মাস্টার একটু হকচকিয়ে গেলেন। 'একেবারে স্পেসশিপ দিয়েই শুরু করবে নাকি? আগে ছোটোখাটো দুটো-একটা জিনিস করলে হয়-না?'

আমি বললাম, 'বেশ তো, আগে ছোটোখাটো জিনিস দিয়েই নাহয় শুরু করা যাবে। ওই যে সেদিন পাক-খাওয়ার মেশিনের কথা বলছিলেন, তাই দিয়েই আরম্ভ করা যাক। ওই বইটাতে তার ছবিও আছে।'

অন্য কেউ হলে হয়তো বকাবকি করত। কিন্তু ছোটো মাস্টার বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। তাহলে বইটা থেকে ওই যন্ত্রটার পার্টগুলোর ছবি আগে এঁকে নিতে হবে। কাগজ পেনসিল রবার সবই তো আছে। মাপ নেবার জন্য কম্পাস ইত্যাদিও লাগবে। ওই মাপেই এঁকো।'

তারপর এক বার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সত্যি সত্যি যাবার ইচ্ছা আছে দেখছি। কাগজে দেখলাম অ্যামেরিকানরা সম্ভবত এ বছরই চাঁদে মানুষ নামাবে।'

আমি আরেকটু হলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই উঠছিলাম। পিছনটাকে চেয়ার থেকে খানিকটা বোধ হয় তুলেই ফেলেছিলাম। কিন্তু সে কথা মনে হতেই ধপ করে আবার চেয়ারের উপর পড়ে গেলাম। ছোটো মাস্টার সব দেখলেন। বললেন, 'লাগেনি তো? চাঁদে যাবে বলে যে সবার আগে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই। তা ছাড়া নিজেদের স্পেসশিপে করে যেতে হলে একটু দেরি তো হবেই। বৈজ্ঞানিকরা আগে গিয়ে দেখেই আসুক-না সেখানকার অবস্থাটা কীরকম। কী বলো? সেই বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। মাটির নীচে উপনিবেশ করতে সময় নেবে।'

আমি বললাম, 'বাবা বলছিলেন, এর মধ্যে রাশিয়ানদের একটা 'জন্ডপাঁচ' চাঁদের চারদিকে ঘুরে ফিরে এসেছে। এর আগে চাঁদে রকেট নেমেছে বটে, কিন্তু এক বার নেমে, আবার উঠে ফিরে আসেনি। বোধ হয় মানুষ না গেলে, সেটা খুব শক্ত হবে। ইস্, পা-দুটোর উপর এমনি রাগ হয়!' এই বলে পা-দুটোকে শক্ত করবার চেষ্টা করলাম। কেমন যেন ঝিঁঝি ধরার মতো মনে হল।

ঠিক সেই সময় একটা ছোটো বান্ডিল হাতে নিয়ে গুপি এসে উপস্থিত। স্কুলের জন্মদিন বলে সেদিন নাকি একটায় ছুটি হয়ে গেছে। পুঁটলিতে কী?

গুপি একটু লজ্জা পেল। খিদিরপুর ডকের কাছে নাকি সস্তায় খুব দরকারি সব পুরোনো জিনিস বিক্রি হচ্ছিল। তারই কিছু কিনে এনেছে। খুলে দেখলাম নাইলনের হাওয়া-বালিশ, হাওয়া না থাকলে রুমালের মতো ছোটো করে ভাঁজ করে ফেলা যায়। নাইলনের জলের বোতল আর খাবার রাখার থলি। হাঁ করে ছোটো মাস্টার গুপির দিকে চেয়ে রইলেন। গুপি বলল, 'হ্যাঁ স্যার, আগে থাকতেই বন্দোবস্ত করা ভালো। বেশিদিন তো আর নেই। নিজেদের খাবার-দাবার নিজেরা নিলেই ভালো। শুনলাম পাঁচ দিনের ওয়াস্তা; পাঁচ দিন! মানে, খালি রকেট সাত দিনে গিয়ে ফিরতে পারে বটে, কিন্তু লোকজন জিনিসপত্র থাকলে নিশ্চয় কিছু বেশি সময় লাগবে। হয়তো যেতে-আসতে পাঁচ-পাঁচ মোট দশ দিন।'

আমি বললাম, 'চোঙা মতো ওটা কী?'

গুপি হেসে বলল, 'এটাই তো আসল জিনিস। চাঁদ দেখার টেলিস্কোপ। কোনো জাহাজের খ্যাপা ক্যাপ্টেন নাকি ওটাকে বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়েছিল, আর ছাড়াতে আসেনি।'

—'টেলিস্কোপ? টেলিস্কোপ দিয়ে কী হবে?'

ছোটো মাস্টার লাফিয়ে উঠলেন, 'আকাশ দেখার টেলিস্কোপ নাকি? সে তো অন্যরকম দেখতে হয়।' তারপর টেলিস্কোপটা বের করে বললেন, 'না, আকাশ দেখার নয়। কিন্তু খুব পাওয়ারফুল। সমুদ্রে দূরে দেখার জন্য ব্যবহার হয়। আকাশে এরোপ্লেন ইত্যাদিও দেখা যায়। দেখবে নাকি, পানু?'

ছোটো মাস্টার টেলিস্কোপের লেন্স পরিষ্কার করে দিয়ে, ফোকাস ঠিক করে, আমার হাতে দিলেন। আমি জানলা দিয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলাম। সব অন্যরকম লাগল। ঠান্ডা ঘরটাকে ভালো করে দেখলাম। মনে হল ছাদে কীসব পাইচারি করছে, ছোটোমতো, সাদা কালো। আলো কম বলে ভালো করে বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ একটা সন্দেহ হল, 'গুপি, নিশ্চয় পে— উঃ!'

গুপি আমার হাঁটুর উপরে খুব জোরে চিমটি কাটল। আমি টেলিস্কোপ নামাতেই, ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে কিছু বলতে মানা করল। মুখে বলল, 'চাঁদ উঠেছে, দ্যাখ ভালো করে।'

চাঁদের দিকে টেলিস্কোপ ফেরালাম। অদ্ভুত লাগল। অবিশ্যি পাহাড়-পর্বত এটা দিয়ে দেখা গেল না। কিন্তু আরেকটা জিনিস দেখে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। স্পষ্ট দেখলাম, জিনিসপত্রে বোঝাই ডানাওয়ালা একটা নৌকোর মতো কী যেন, চাঁদের মুখের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে ভেসে গেল। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে তার কুচকুচে কালো আকৃতি পূর্ণিমার চাঁদের সোনালি গায়ের উপর পরিষ্কার ফুটে উঠল। তারপরেই চাঁদ পেরিয়ে এক টুকরো কালচে মেঘের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার মুখ দেখে ওরা দু-জন চ্যাঁচাতে লাগল। 'কী হল? কী হল? শরীর খারাপ হল নাকি?' আমি বললাম, 'না। চাঁদে যাবার প্রথম নৌকোটাকে বোধ হয় দেখলাম। লটবহর নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, গুপি, ছোটোমামা কি—'

গুপি বলল, 'চোপ।'

ছোটো মাস্টার তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, 'আচ্ছা, আমি তাহলে আসি। আমি থাকলে তোমাদের কথাবার্তার অসুবিধা হয়। তা ছাড়া, নাইট ক্লাসের আর বেশি দেরিও নেই।' বলেই, বোধ হয় একটু রেগে হনহন করে চলে গেলেন।

খুব খারাপ লাগল। কিন্তু গুপি খুশি হয়ে বলল, 'যাক, বাঁচা গেল, লোকটা ঠিক ছিনেজোঁক, কিছুতেই তোকে ছাড়তে চায় না।'

আমি বললাম, 'না রে গুপি। উনি রবিবার ছাড়া রোজ আমাকে দু-ঘণ্টা করে হাতের কাজ শেখাবেন। প্রথমে আমরা স্পেসশিপের মডেল বানাব। তারপর সেটাকে বড়ো করে বানাতে কতক্ষণ!'

শুনে গুপিরও কী উৎসাহ!

আমি বললাম, 'আচ্ছা, ছোটোমামাকে তো আর একদিনও দেখতে পেলাম না, গুপি। চাকরি গেল নাকি?'

গুপি বলল, 'আরে, না, না, তাই যায় কখনো! ছোটোমামা ভয়ংকর চালাক, প্রেসের ভিতরে আজকাল ওর দিনের বেলায় ডিউটি। বড়ো সাহেবকে পটিয়েছে। ক্যান্টিন দেখে। তারজন্যে পয়সা নেয় না, কিন্তু দু-বেলা খাবার পায়। বড়ো সাহেবরা যা খায়, ও-ও তাই খায়। চপ, কাটলেট, মুরগি ভিন্দালু, পুডিং।'

দু-জনেই খানিকক্ষণ চুপ করে সেসব কথা ভাবতে লাগলাম। তারপর গুপি বলল, 'কিন্তু বড়ো মাস্টারের কী রাগ! ওকে চেনেন না, জানেন না, তবু কেবলই ছোটো সাহেবের কান ভাঙাতে চেষ্টা করবেন। স্রেফ হিংসে। ছোটোমামা খাবে ক্যান্টিনে, আর বুড়ো খাবে তেওয়ারির দোকানে,

এই আর কী! সমস্তক্ষণ ছোঁকছোঁক করে ছোটোমামার পিছনে ঘোরেন, প্রুফ দেখেন না হাতি! একটু যে তদন্ত করবে, ছোটোমামা সে জো নেই!'

আমি বললাম, 'কেন, রাতে তদন্ত করলেই হয়।'

শুনে গুপির কী হাসি, 'তাহলেই হয়েছে! ছোটোমামার যা ভূতের ভয়! ও রাতে গলি দিয়ে নামল আর কী!'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। 'তবে-না নাইট ওয়াচম্যানের বদলির কাজ নিয়েছিল বলেছিলি?'

গুপি বলল, 'তাতে কী হয়েছে! সব নাইট ওয়াচম্যানরা ভূতের নামে জুজু। ছোটোমামা সিঁড়ির মাথা থেকেই চৌকিদারি করত। আগের ওয়াচম্যানই তাই বলে দিয়েছিল। সে-ও তাই করত। এখানকার রাতের পাহারাওয়ালারাই তাই করে। আর যারা ভূতে বিশ্বাস করে না, তারা দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমোয়। মোট কথা ঠান্ডা ঘরে কীরকম স্পেসশিপ তৈরি হচ্ছে, আর কারাই-বা তৈরি করছে, এ বিষয়ে এতটুকু তদন্ত করার সময় পাচ্ছে না ছোটোমামা। তা ছাড়া ওই সরকারি ছাপাখানাটা কি কম পুরোনো ভেবেছিস নাকি। কোম্পানির আমলে ওটা এদিককার সবচেয়ে বড়ো গুদোমঘর ছিল। মোটে আশি বছর হল ছাপাখানা হয়েছে। ভূতফুত থাকলে ওইখানেই থাকা কিছু বিচিত্র নয়। ছোটোমামা রাতে শুয়ে শুয়ে হাঁচড়পাঁচড় উঁয়া-উঁয়া শব্দ শোনে। কোনদিন-না আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যায়।'

আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, 'মানা কর, গুপি, বাড়িতে পা দিয়েছে কি ক্যাঁক করে সামন্ত ওকে ধরবে। ওর ঘরে-না চোরাই গাড়ির নম্বরপ্লেট পাওয়া গেছে!'

গুপি বলল, 'আরে দূর! দূর! সে-বিষয়ে ছোটোমামাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলল নাকি বড়ো রাস্তার ওদিকে পুরোনো লোহার ডাঁই আছে, সেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছে। গাড়ির নম্বরপ্লেট খুলবে ও! আমাকে দিয়ে নিজের পেনসিল কাটায়, ব্লেড দেখলে ওর গা শিরশির করে! নেংটি ইঁদুর ভয় পায়।'

তারপর হঠাৎ থেমে গুপি বলল, 'ছোটো মাস্টারকে কি চোরাই কারবারি মনে হয়?'

ভয়ানক রাগ হল। বললাম, 'আমাদের বাড়িতে যারা আসে যায়, তাদের তোর সন্দেহবাতিক থেকে বাদ দে। সামন্তর তো ধারণা যে তোর ছোটোমামাই চোরাই কারবারের চাঁই।'

গুপি তার জিনিসপত্র গুটিয়ে তুলে চলে গেল। দরজার কাছ থেকে বলে গেল, 'আশা করি এর পরেও ছোটোমামার স্পেসশিপে জায়গা আশা কর না।'

আমিও চটেমটে বললাম, 'যারা স্পেসশিপ বানায়, তারা পুরোনো লোহার ছ্যাকড়া ঘুড়ি চড়ে না।'

গুপি চলে গেলে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। স্কুলের সব খবর ওর কাছেই পাই। বলতে গেলে ও-ই আমার একমাত্র বন্ধু। ছোটো মাস্টারের হাতে-লেখা চাঁদ বিষয়ক নোট বইটা খুলে বসলাম। তাতে এই সব লেখা:

(১) চাঁদ পৃথিবী থেকে গড়পড়তা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে।

(২) তার মধ্যে দুই লক্ষ ষোলো হাজার মাইল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির এলাকার মধ্যে। বাকি চব্বিশ হাজার মাইল চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের এলাকায়।

(৩) চাঁদে নামতে হলে প্রথমে মনে রাখতে হবে সেখানে বাতাস নেই। শব্দতরঙ্গ ওঠে না, অর্থাৎ কানে কিছু শোনা যায় না। নিশ্বাস নেবার অক্সিজেন নেই, কাজেই অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। বায়ু নেই বলে সূর্যের আলোর বেজায় তাপ। আর রাতে বেজায় ঠান্ডা।

(৪) চাঁদের একেকটা দিন আর রাত আমাদের চোদ্দো দিনের সমান লম্বা। এক দিন আর এক রাতেই চাঁদের এক মাস কাবার হয়।

(৫) চাঁদ সর্বদা পৃথিবীর দিকে তার একটা পিঠই ফিরিয়ে রাখে। পৃথিবী থেকে অন্য পিঠটা দেখা যায় না, তবে রকেট থেকে তার ছবি তুলে দেখা গেছে যে সে-দিকে পাহাড়-পর্বত কম। নামতে হলে ওদিকেই সুবিধা।

(৬) প্রথম বৈজ্ঞানিকরা চাঁদে গিয়ে, মাটির নীচে উপনিবেশ তৈরি করবে। তাহলে রাতের বড়ো বেশি ঠান্ডা আর দিনের বড়ো বেশি গরম থেকে বাঁচা যাবে। উপনিবেশটা হবে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত।

(৭) নিশ্বাস নেবার অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে আর নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরুবে তাকে দূর করতে, ক্লরেলা বলে একরকম শ্যাওলার চাষ করা হবে, মাটির নীচের সেই উপনিবেশে ক্লরেলার অন্য নাম ডাকউইড।

এইসব পড়ে আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু তাহলে আমাদের বাতাসের ব্যাবসাটা তুলে দিতে হয়। তা হোক। ক্লরেলার চাষ করব। তাহলে জমি কিনতে হবে মাটির নীচে।

ভেবে দেখলাম চাঁদের মাটির তলার উপনিবেশে কী কী লাগতে পারে। জোনাকি পোকা সরবরাহ করা যায়। লক্ষ লক্ষ জোনাকি ছাড়লে মাটির তলার গুহাঘর নিশ্চয় আলো হয়ে থাকবে। তবে হয়তো বিজলিবাতির ব্যবস্থা হবে। তাহলে জোনাকি লাগবে না। এক যদি না বিজলি বাঁচাবার জন্যে স্নানের ঘরেটরে ব্যবহার করা যায়। জোনাকি দিয়ে বোধ হয় রান্নার উনুন জ্বালানো যাবে না। একবার ধরেছিলাম মুঠো করে পাঁচ সাতটা। একটুও গরম মনে হয়নি।

পরদিন রবিবার। যখন বড়ো মাস্টার এলেন, চাঁদের সম্বন্ধে না বলে পারলাম না। মিটমিট করে হাসতে লাগলেন। বললেন, 'তার চেয়েও অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক কথা হল যে আমাদের এই ভারতের দক্ষিণ দিকের তীরভূমির কাছাকাছি সমুদ্রের তলা থেকে রাজার ঐশ্বর্য তোলা যায়।'

আমি বললাম, 'মুক্তো?'

বড়ো মাস্টার হাসতে লাগলেন, 'মুক্তো হবে কেন? মুক্তো আর এমন কী, আজকাল মুক্তোর চাষ হয়, মুক্তোর দিন গেছে।'

—'তবে?'

বড়ো মাস্টার বললেন, 'জাহাজডুবির কথা শুনেছিস?'

'ইংরেজরা এদেশের নাম শোনার অনেক আগে পোর্তুগিজরা ব্যাবসা করতে আসত। আবার জলদস্যু বোম্বেটেরাও ছিল। সমুদ্রে লড়াই হত, ঝড় হত, ডুবন্ত পাহাড়ে জাহাজের তলা ফেঁসে যেত, জাহাজডুবি হত। তার অনেক জাহাজ এখনও সমুদ্রের তলায় পড়ে আছে। সোনারুপোর গয়না, হিরে মণি মাণিক, এত বড়ো বড়ো মোহর সমুদ্রের নীচেকার বালির উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। কত লোকে নিজের চোখে দেখে এসেছে। আমিও।'

আমি অবাক হয়ে বড়ো মাস্টারের মুখের দিকে তাকালাম। চেয়ারের হাতলে দু-হাত চাপড়ে কেঠো পা মাটিতে ঠুকে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও। এবং এই কাঠের পা নিয়েই, আমাকে কি ওই ফেরারি ছোটোমামাটির চেয়ে কম ঠাউরেছিস নাকি?'

চমকে উঠেছিলাম। তবে কি গুপি ভুল বলল, 'ছোটোমামাকে বড়ো মাস্টারমশাই চিনে ফেলেছেন। তাহলে সামন্তের কানে কথাটা তুলতেই-বা কতক্ষণ! হয়ে গেল চাঁদে যাওয়া। সঙ্গেসঙ্গে মনে পড়ে গেল ছোটো মাস্টারের কথা। বড়ো মাস্টার বললেন, 'হাসছিস যে বড়ো? আমার কথাটা বিশ্বাস হল না বুঝি?'

—'না, না, সেজন্যে নয়, ডুবো জাহাজের কথা খুব বিশ্বাস করেছি। কিন্তু কাল টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলাম, জিনিসপত্রে বোঝাই আকাশি নৌকো চাঁদে যাচ্ছে।'

—'সে কী! চাঁদে জনমানুষ নেই, জিনিসপত্র যাচ্ছে আবার কী? কেনই-বা যাচ্ছে?'

আমি বললাম, 'বাঃ, মাটির তলায় উপনিবেশ হবে যে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত উপনিবেশ তৈরি করতে হলে যন্ত্রপাতি, তার, তক্তা, স্ক্রু ইত্যাদি লাগবে না?'

বড়ো মাস্টার চোখ থেকে চশমা জোড়া খুলে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন! তারপর বললেন, 'বুড়োধরার কথা বলেছিলাম কি?'

সাত

আমি বললাম, 'বুড়োধরা আবার কী? সেরকম আছে বলে তো শুনিনি।'

বড়ো মাস্টার বললেন, 'তা যদি না থাকত তো এতদিনে এই পৃথিবী বুড়োতে ছেয়ে যেত। তোদের আর দাঁড়াবার জায়গা থাকত না।'

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, 'আপনাকে ধরেছিল বুঝি?'

বড়ো মাস্টার রেগে গেলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'আমাকে আবার বুড়ো দেখলি কোথায়? বুড়োরা দিনের মধ্যে দশ বার কেঠো পা নিয়ে পাঁচ তলা অবধি ওঠা-নামা করতে পারে?'

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেললাম, 'গুপির ছোটোমামা বলেন আপনি ছাপাখানার লিফ্‌টে চড়ে চার তলায় ওঠেন, তারপর সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে পাঁচ তলায় ওঠেন। সেটুকু সব বুড়োরাই পারে।'

মাস্টারমশায়ের মুখটা প্রথমে লাল হয়ে তারপর বেগনি হয়ে গেল। আমি তো ভয়েই মরি, এক্ষুনি-না ফেটে যান।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে মাস্টারমশাই বললেন, 'গুপির ছোটোমামা মানে সেই কুখ্যাত ফেরারি আসামি চাঁদু তো? সে আমাকে কোথায় দেখল?'

আমি তো মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। এর আগেই গুপি আমাকে বলেছিল যে ছোটোমামার প্রাণ আমার হাতে। আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'ওঁর ভালো নাম নৃপেন্দ্রনারায়ণ।'

—'তা হতে পারে, কিন্তু সে আমাকে দেখল কোথায়?' এই বলে বড়ো মাস্টার আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, 'না, তা নয়, দেখেননি হয়তো। কিন্তু উনি বলেছিলেন যে সরকারি ছাপাখানার লিফ্‌ট তো চার তলায় শেষ। তারপর বোধ হয় তোদের মাস্টারমশাইকে হাঁটতে হয়।'

—'কাকে বলছিলেন? তোকে?'

—'না, না, আমাকে তো ভলো করে চেনেন না, তাই গুপিকেই বলেছিলেন। গল্পটা বলবেন না?'

বড়ো মাস্টার ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ওঃ, আমার জন্যে ভেবে ভেবে চাঁদুর বুঝি ঘুম হয় না? গুপিকে বলিস ওকে বলে দিতে— ও কী! অমন চমকে উঠলি কেন?'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বুঝেছি। বলবে কী করে? সে এতক্ষণে জলঢাকায় কি সোফিয়ায় কি নাথুলায় কি কোথায় তাই-বা কে জানে!'

আমি বললাম, 'তা ছাড়া গুপির সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে, সে এখন আমাদের বাড়িতে আসবে না।'

সঙ্গেসঙ্গে গুপি ঘরে ঢুকে বলল, 'না স্যার, ওর কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না, স্যার। ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে আসব নাই-বা কেন, আপনার গল্প শুনব নাই-বা কেন, খাব নাই-বা কেন?'

এই বলে রামকানাইয়ের হাত থেকে ছোটো ছোটো মাংসের বড়া আর আলুমটর সিদ্ধর থালাটা নামিয়ে নিয়ে, তিনটে প্লেটে ভাগ করতে লাগল। মাস্টারমশাই এক বার ওর দিকে, এক বার আমার দিকে তাকাতে তাকাতে চামচ দিয়ে খেতে লাগলেন। তখন গুপি পকেট থেকে দুটো মলাট-আলগা বই বের করে বলল, 'তা ছাড়া, ওর এসব পড়া দরকার। নইলে চাঁদে যাবার মতো যথেষ্ট জ্ঞান হবে কী করে?'

চোখ বুলিয়ে দেখলাম। একটার নাম, 'চাঁদ উপনিবেশ' অন্যটার নাম, 'চাঁদের আবহাওয়া'। ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে কথা বলে কাজ নেই। বই দেখে বললাম, 'কোথায় পেলি রে?'

গুপি বলল, 'ছোটো স্যারের কাছ থেকে নিয়েছিলাম।'

মাস্টারমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমাদের মাথা খেতে আর বড়ো বেশি বাকি রাখেনি তলাপাত্র। ওটা কীসের মডেল?'

আমি খুব খুশি হলাম। বললাম, 'ওটা স্পেসশিপের পার্ট। ওর ভিতরে মানুষরা বসে থাকবে, মহাকাশযান পাক খেলেও মানুষগুলো স্থির হয়ে বসে থাকবে।'

বড়ো মাস্টার একটুক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'পুনালুর গেছিস কখনো?' আমরা তো অবাক।

পুনালুর আবার কোথায়? কোনো গ্রহের উপগ্রহ-ট্রহ নয় তো?

মাস্টারমশাই হেসে বললেন, 'ওই যা বলি, চাঁদ চাঁদ করে তোরা খেপে গেলি, অথচ এই পৃথিবীটার কিছুই দেখলি না। পুনালুর শুধু এই পৃথিবীতে নয়, আমাদের নিজেদের দেশে। মাদ্রাজ থেকে ত্রিবান্দ্রাম যেতে হলে প্রায় একটা গোটা দিন লেগে যায়। পথে খাওয়ার খুব ভালো ব্যবস্থা না থাকলেও, যেই-না পশ্চিমঘাট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আমাদের ট্রেন পুনালুরে থামল, প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছোট্ট একটা স্টেশন, তারপরেই সমুদ্রের গন্ধ পেলাম। তারপরেই কুইলন বলে একটা জায়গায় নেমে পড়লাম। সঙ্গে সামান্য জিনিসপত্র। কিছু কাপড়-চোপড়, একটা শতরঞ্চি আর হাঁসের সাজ!'

আমি বললাম, 'হাঁসের সাজ আবার কী মাস্টারমশাই?'

বড়ো মাস্টার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। 'হাঁসের সাজ কী তাও জানিস না? এই বিদ্যে নিয়ে চাঁদে যেতে চাস? হাঁসের সাজ না পরলে সমুদ্রের তলায় সরেজমিন তদন্ত করব কী করে শুনি? কেঠো পায়ের উপর আড়াইমনি ডুবুরির পোশাক চাপালেই হয়েছে আর কী!'

গুপি গলা খাঁকরে বলল, 'অবিশ্যি জলের নীচে আড়াই মন আর কিছু আড়াই মন থাকে না! বয়েন্সি অর্থাৎ প্লবতা জলের একটা গুণ!'

বড়ো মাস্টার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'থাক, আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। এও নিশ্চয় তলাপত্রর কাছে শেখা?— বেশ, আড়াই মন নাহয় দেড় মনই হয়ে যাবে, তবুও আমার শরীরের আড়াই মন তার সঙ্গে জুড়তে হবে। কাঠের ঠ্যাং হয়তো ত্রিশ বছর সেই জাহাজের রান্নাঘরের টেবিল ঠেকিয়েছে। তারপর আমার কাছেই আছে ধর এই পঁয়ত্রিশ বছর। আর কত সইবে?'

গুপি বলল, 'আচ্ছা, এবার বলুন হাঁসের সাজের কথা।'

বড়ো মাস্টার বললেন, 'আর কিছু নয়, দু-পায়ে প্লাস্টিকের তৈরি বড়ো বড়ো হাঁসের পা লাগিয়ে, মুখে মুখোশ, চোখে বড়ো বড়ো গগল্‌স্ এঁটে, পিঠে অক্সিজেনের থলি বেঁধে, মুখোশের ভিতরে

নাকে তার নল গুঁজে, হাতে হার্পুন নিয়ে তৈরি হয়ে নিতে কতক্ষণ লাগে! অতিরিক্ত বেশি পয়সাকড়ির বালাই নেই, সঙ্গে রিটার্ন টিকিট আর যৎসামান্য খাইখরচা। তা ছাড়া ছোট্ট বিছানা আর কাপড়-চোপড়। বাদাম গাছের মগডালে সেগুলো ঝুলিয়ে রেখে, কুইলনের সমুদ্রের ধারে গিয়ে জেলেদের একটা নৌকো ভাড়া করলাম। তীর থেকে সিকি মাইলটাক গিয়ে নৌকোতে বসে বসেই যেই-না হাঁসের সাজ পরেছি, ভয়ের চোটে নৌকোর মাঝি মাঝদরিয়ায় নৌকো থেকে নেমে যায় আর কী! অনেক করে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নৌকো থেকে টুপ করে জলে নেমে পড়লাম! নেমেই টের পেলাম ব্যাটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাঙার দিকে পাড়ি দিল। যাক গে, এসব সামান্য জিনিসে আমি ভয় খাই না। মিছিমিছি তো আর বর্মার শ্রেষ্ঠ সাঁতারুর সম্মান পাইনি। মানপত্র, সুবর্ণ পদক, টাকার থলি— যাক গে, নিজের বিষয়ে বেশি বলা আমি পছন্দ করি না।

'আস্তে আস্তে ডুব দিলাম। একেবারে সমুদ্রের তলাকার বালির উপর নামলাম। বুঝতেই পারছিস সমুদ্র সেখানে বেশি গভীর নয়, বিশেষ করে এই গরমের সময়ে। গভীর না হলেও অদ্ভুত। কানে কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু সবুজ আলোতে সব দেখতে পাচ্ছিলাম। অদ্ভুত আকারের মাছ, সমুদ্রের কচ্ছপ আর কতরকম পলা আর আগাছা।

তলাপাত্র তোদের যে এতরকম জ্ঞান দেয়, আশা করি একথা বলতে ভোলেনি যে পৃথিবীর তিন ভাগ যখন জল আর মাত্র এক ভাগ মাটি, তখন মাটিতে যত-না ফসল হয়, জলে হতে পারে তার তিন গুণ। দেখলাম সেসব ফসলের কিছু কিছু একেবারে গিজগিজ করছে, শুঁড় নাড়ছে, দাঁত দেখাচ্ছে, চোখ পাকাচ্ছে। ডাঙায় তুলে রেঁধে খেলেই হল। হাজার বছরের খাদ্য মজুত আছে সমুদ্রের নীচে! চাঁদে জমি কেনার কথা বলিস তোরা, সমুদ্রের তলাকার জমি কিনতে পারলে আর কথা নেই।

'এক জায়গায় দেখলাম একেবারে জ্যান্ত ঝিনুক ছেয়ে আছে! প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করে বড়ো মুক্তো না থাকে তো কী বলেছি!'

গুপি বলল, 'তুললেন না কেন দু-চারটে?'

বড়ো মাস্টার ভুরু কুঁচকে বললেন, 'সামান্য মুক্তো তুলে সময় নষ্ট করব নাকি? আমার সামনে ছিল তার চেয়ে অনেক বড়ো উদ্দেশ্য। যার জন্যে এই অভিযান। তা ছাড়া দুটো চারটে যে তুলিনি তাই-বা কী করে জানিস! দেখিস গিয়ে তোদের বউঠানের কানে। চোখ টেরা হয়ে যাবে।'

বড়ো মাস্টার পানের ডিবে খুলে রামকানাইয়ের দিকে তাকালেন। রামকানাই রেডি ছিল। পকেট থেকে ভিজে ন্যাকড়ায়-জড়ানো গোটা ছয় বড়ো পান বের করে ডিবে ভরে দিল। আজকাল দেখছি পারলে রামকানাই বড়ো মাস্টারের গল্প শুনতে ছাড়ে না। পরে অবিশ্যি নানারকম মন্তব্য করে। ভারি ইয়ে হয়েছে ওর। যাই হোক, মুখে দুটো পান পুরে, দাঁতে চুনের টিপ মুছে, মাস্টারমশাই বলতে লাগলেন।

—'একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপরে না উঠলে অক্সিজেনের থলি খালি হবার ভয় থাকে। তাতে অবিশ্যি ডাঙায় ফেরার অসুবিধে হয় না। উপরে উঠে সাঁতরে ফিরলেই হল। কিন্তু তদন্ত করতে হলে, তাড়াতাড়ি কাজ করলে হয় কখনো?

'আর একাজ সারতে হবে খুব গোপনে। কেউ টের পেলেই হয়ে গেল। হাঁসের সাজ পরে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়বে! পাকা খবর না নিয়ে যাইনি। খুব গূঢ় খবর। ওইখানে একটা পুরোনো পোর্তুগিজ জলদস্যুদের সমুদ্রের জাহাজ বমাল সমেত ডুবে পড়ে আছে। তিন-শো বছরের বেশি হয়ে গেছে।

'বর্মায় থাকতেই একজন নাবিক আমার বাবার কাছে একটা চিঠি আর এক সমুদ্রের তলার ছেঁড়া ম্যাপ এক টাকা দিয়ে বিক্রি করেছিল।—'

গুপি অবাক হয়ে গিয়ে বলল, 'মোটে এক টাকা দিয়ে?'

বড়ো মাস্টার বললেন, 'কেন, এক টাকা কি কম নাকি? আমার ঠাকুরদার বাবা এক টাকা দিয়ে এক-শো মন ধান কিনতেন। এক টাকা রোজগার করতে পারিস? গল্প শুনবি, না কি?'

গুপি বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর?'

—'তারপর হঠাৎ পায়ে কী একটা ফুটল। তুলে দেখি একটি মোহর, খাড়া হয়ে বালিতে বিঁধে আছে। চেয়ে দেখি চারদিকে বালিতে ছড়ানো হাজার হাজার মোহর। সামনে একটা পুরোনো লোহার সিন্দুক ভেঙে পড়ে আছে। জং ধরে সবুজ হয়ে গেছে। তার গায়ে কত খুদে খুদে সামুদ্রিক প্রাণী বাসা বেঁধেছে।

'চোখ তুলে দেখি আরেকটু দূরে মস্ত মরা তিমি মাছের মতো একটা পুরোনো জাহাজ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। খোলটা উপর দিকে, তাতে অসংখ্য ছোটো-বড়ো ছ্যাঁদা। তার ভিতর দিয়ে শত শত ছোটো, বড়ো, লাল, কালো, হলদে মাছ আসছে, যাচ্ছে। চেয়ে চেয়ে আর কূল পাই না। তবে বেশিক্ষণ চাইতে হল না। চারদিক থেকে নিঃশব্দে পনেরো-কুড়িটা ছায়া নেমে এল। দেখলাম পনেরো-কুড়িটা সাহেব। সকলের হাঁসের সাজ, সঙ্গে শুধু হার্পুন নয়, বন্দুকও। প্ল্যাস্টিকের থলিতে ভরা, যাতে ভিজে না যায়।

'তারপর আর কী, দেখতে দেখতে আমাকে ধরে ফেলে তারা ভাঙা নৌকোর কানা তুলে তার ভিতরে পুরে দিল। বলিনি এই ঘটনার বিষয়বস্তু হল বুড়ো ধরা? এবং সত্যিই আমিই সেই হতভাগ্য বুড়ো। তারপর যত পারল সোনাদানা চেঁচেপুঁছে নিয়ে চলে গেল।

'আমি প্রথমটা জাহাজের খোলের ভিতরকার গাঢ় অন্ধকার দেখে, হকচকিয়ে গেলাম। তারপর আস্তে আস্তে যখন চোখ সয়ে গেল, তখন চেয়ে দেখলাম কত কঙ্কাল চারদিকে ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া কত যে গয়নাগাটি ছড়ানো, সে আর কী বলব।'

গুপি বলল, 'আনলেন না স্যার, তাহলে এখন কত সুবিধে হত! স্পেসশিপের অনেক খরচ।'

বড়ো মাস্টার বললেন, 'তখন আমি বেরুবার পথ খুঁজতে ব্যস্ত, গয়না তোলার কথা মনেও হয়নি। তা ছাড়া কঙ্কালগুলো জলের মধ্যে কেমন নড়ছিল চড়ছিল। শেষপর্যন্ত হার্পুন দিয়ে একটা ছ্যাঁদাকে আরেকটু বড়ো করে নিয়ে, বেরিয়ে পড়লাম। এদিকে অক্সিজেন প্রায় শেষ, কোনো মতে জলের উপরে উঠলাম। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। কোনোরকমে সাঁতরে ডাঙায় উঠলাম। তারপর বাদাম গাছের নীচে গিয়ে দেখি সর্বনাশ, বাঁদররা সব জিনিসপত্র তছনছ করে, চারদিকে ছড়িয়েছে! অন্য জিনিস প্রায় সবই পেলাম। শুধু সেই চিঠিটা আর ম্যাপটা ছাড়া মাঝে মাঝে কাগজে যখনই দেখি ডুবো জাহাজের সন্ধান পাওয়া গেছে ভারতের উপকূলের কাছে, ভাবি এই আমার সেই জাহাজ।'

গুপি বলল, 'তবে জাহাজটা তো আর সত্যি করে আপনার নয়। অন্যরাই-বা নেবে না কেন?'

বড়ো মাস্টার বললেন, 'আমার নয় মানে? দস্তুরমতো এক টাকা দিয়ে ওর কাগজপত্র কেনা হয়নি বলতে চাস?'

তারপর বললেন, 'বোধ হয় আমার ওই নৌকোর মাঝি সাহেবদের গুপ্তচর ছিল। আমাকে নামিয়েই শহরে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছিল। এইরকম করেই সাহেবদের অত টাকা হয়েছিল।—

নইলে এমনি সময় আমাদের গলিতে সে কী দুপদাপ ক্যাঁও ম্যাও! জানলা দিয়ে দেখি স্রোতের মতো বেড়ালের পাল ছুটে বেরিয়ে আসছে। বড়ো মাস্টার লাফিয়ে উঠে খটখট করতে করতে দৌড় দিলেন। দেখলাম তাঁর মুখটা অস্বাভাবিক রকমের সাদা। সঙ্গে সঙ্গে গুপিও ছুটল।

আট

আমি তো হাঁ করে বসেই রইলাম। রামকানাই এসে খাবারদাবারগুলো তুলে নেবার তালে ছিল। বারণ করলাম। বললাম, 'থাক, ওদের পুষ্টিকর খাবার দরকার হতে পারে। অস্বাভাবিকরকম দৌড়োচ্ছে।' রামকানাই ফোঁস শব্দ করে চলে গেল। আরও অনেকক্ষণ পরে গুপি ফিরে এসে কোনো কথা না বলে খেতে আরম্ভ করে দিল।

তারপর খানিকটা জল খেয়ে বলল, 'উঃফ্, ভাবা যায় না।'

আমি বললাম, 'নেপোকে দেখলে?'

গুপি মাথা নাড়ল। 'কই, না তো। তবে ওই শত শত বেড়ালের মধ্যে চোখে নাও পড়তে পারে।'

আমি চটে গেলাম। 'নেপোকে চোখে নাও পড়তে পারে মানে? সাধারণ বেড়ালের দেড়া সাইজ ওর, গোঁপগুলো পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, বেঁড়ে ল্যাজ। চোখে পড়তে বাধ্য।'

গুপি বলল, 'তবে ছিল না।'

এমনসময় বড়ো মাস্টারও হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলেন। ময়লা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'সারাজীবন ধরে কোথায় না গেলাম, কী না দেখলাম। কিন্তু এর সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হয় না। দশ ফুট চওড়া বেড়ালের নদীর কথা কেউ কখনো শুনেছে? তার উপর বেড়ালের ঢেউ।'

আমি তো অবাক! বেড়ালের ঢেউ আবার কী?

গুপি বলল, 'তাও বুঝলি না? পেছনের বেড়াল যদি বেশি জোরে দৌড়য়, তাহলে সামনের বেড়ালের পিঠের উপর উঠে পড়বে। অমনি সেখানে ঢেউ উঠবে।'

বড়ো মাস্টার চেয়ারে বসে কেবলই মাথা নাড়তে লাগলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'বলুন-না গঙ্গার ধারে কী হল?'

গুপি আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলল, 'বেড়ালের নদীর মাথায় তিনটে লোক দৌড়োচ্ছিল। তাদের চুল খাড়া, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। বেড়ালরা একবার ধরে ফেললেই তো হয়ে গেল।'

বড়ো মাস্টার বললেন, 'দু-জনের মাথায় দুটো মাছের চুপড়ি, এক জনের মুখে দাড়ি। প্রাণের ভয়ে চুপড়ি ফেলে প্রথম দু-জন দে দৌড়। বেড়ালের স্রোত এতটুকু থামল না।'

গুপি বলল, 'সামনের বেড়ালরা হয়তো থেমেছিল, কিন্তু তাদের মাথার উপর দিয়ে পেছনের বেড়ালরা সমান বেগে ছুটে চলাতে কিছু টের পাওয়া গেল না। ফেরার সময় দেখলাম চুপড়িগুলোর দুটো-একটা বাঁশের কুচি পড়ে আছে। আর কিছু নেই।'

আমি উত্তেজনার চোটে চেয়ার থেকে ছয়-সাত ইঞ্চি উঠেই পড়েছিলাম। 'আর বেড়ালরা? নেপোকে তো খোঁজা দরকার।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'তাকে আর পেয়েছ! নদীর ধারে পৌঁছে লোক তিনটে আর কোনো উপায় না দেখে, ঝপাঝপ দুটো খালি যাত্রীর নৌকোয় লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গেসঙ্গে রাশি রাশি বেড়াল।

তাই দেখে ঘাবড়ে গিয়ে যেখানে যত মাঝি ছিল যে-যার নৌকো নিয়ে পাড়ি দিল। আর বেড়ালরাও ঝুপ ঝাপ করে সেসব নৌকোয় চেপে বসল। পাঁচ মিনিটে গঙ্গার ধার ভোঁ ভাঁ। শুধু যারা হাওয়া খেতে গেছিল তারা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল আর দূর থেকে কানে এল একটা ম্যাও-ম্যাও শব্দ। এ-রকম যে সত্যি হতে পারে কে ভেবেছিল। আমিও না। অথচ একদিন এই আমি ব্রেজিলের সত্যিকার কাঁকড়ামতী নদী থেকে, প্রাণ হাতে নিয়ে বেঁচে এসেছিলাম। সে এক—'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'না, না, শুনব না। এত বেড়ালের মধ্যে নিশ্চয়-ই নেপো ছিল। কেন তাকে ধরে আনলেন না?'

খুব কান্না পাচ্ছিল। তার মধ্যে গুপি কর্কশ গলায় বলল, 'যদি থেকেও থাকে, তার বাড়ি ফেরার কোনো মতলব নেই।'

মাস্টারমশাইয়ের কী যেন মনে পড়াতে উঠে বললেন, 'যাই, আমার কাজ আছে। দ্যাখ, পানু, আমাদের বড়ো সাহেব তোর জন্যে সায়ামিজ ক্যাটের বাচ্চা দেবে বলেছে। তোর বেড়াল হারানোর দুঃখের কথা শুনে তার বড়ো কষ্ট হয়েছে! আচ্ছা চলি।'

বড়ো মাস্টার চলে গেলে গুপি আমার কাছে চেয়ার টেনে বসে বলল, 'ব্যাপারটা কিন্তু খুব ঘোরালো। যতদূর দেখলাম বেড়ালগুলো বেজায় মোটা। আর প্রত্যেকের গলায় ছোট্ট একটা করে সাদা টিকিট বাঁধা। সাধারণ বেড়াল নয় ওরা।'

আমি নাক টানতে লাগলাম। কান্না পেলে আমার সর্দি লাগে। গুপি আবার বলল, 'বেড়াল তাড়া-করা দাড়িওয়ালা লোকটা ছোটোমামা।'

এমনি চমকে গেলাম, যে সত্যি সত্যি চেয়ায়-গাড়ি থেকে পড়ে গেলাম। রামকানাই ছুটে এল। দু-জনে মিলে আমাকে টেনে তুলল। পায়ের গোড়ালিতে খুব ব্যথা লাগল। কানে এল ঠান্ডাঘর থেকে ঠক— ঠক— ঠক—।

গুপি বলল, 'শুনতে পাচ্ছিস না? স্পেসশিপ তৈরি হচ্ছে। তবু ব্যাপারটা বুঝতে পাচ্ছিস না? ওই বেড়ালরা কে তা টের পাচ্ছিস না?'

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

গুপি বলল, 'ওরাই হল প্রথম ভারতীয় চন্দ্রযাত্রী। ট্রেনিং নিচ্ছে। আমি তখুনি সব বুঝতে পেরেছি কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের সামনে কিছু বলিনি। ভারতীয় মানুষ যাবার আগে ওরাই চাঁদে যাবে। নেমে যদি আমাদের আগে চাঁদে যায়, তাতে তোর গর্ব হওয়া উচিত, নাক টানা উচিত নয়। ভেবে দ্যাখ, আমরা পৌঁছোলে তার কী আনন্দটাই হবে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু পালিয়ে গেছে যে। চাঁদে যাবে কী করে?'

গুপি বলল, 'মোটেই পালায়নি। যাদের নেয়নি, তারাই পালিয়েছে। হয়তো গলার টিকিটে লেখাই ছিল, অমনোনীত, পড়তে তো আর পারিনি।'

আমি বললাম, 'তা হলে কী করা উচিত?'

গুপি বলল, 'এখন মোটে সাতটা। আটটা অবধি বসি। ছোটোমামা ঠিক সাঁতরে ফিরে আসবে। দারুণ সাঁতার কাটে জানিসই তো। সেবার সেই যে সোনার মেডেল পেল। বেড়ালরা কিছু জলে নেমে ওর পেছন পেছন সাঁতার দেবে না।'

সঙ্গেসঙ্গে চুপ্পড় ভিজে ছোটোমামার প্রবেশ। দাড়িগুলো ভিজে গালের সঙ্গে লেপটে রয়েছে।

আমাকে বললেন, 'পানু, প্যান্ট দে, গেঞ্জি দে, গামছা দে।' আমার আলনাতেই সব ঝোলানো থাকে। পাশেই স্নানের ঘর। দশ মিনিটের মধ্যে গা মুছে, কাপড় বদলে ছোটোমামা চেয়ারে বসে

ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। নাকি গলায় দাড়ি জড়িয়ে গিয়ে সাঁতারের খুব কষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া ইলিশ মাছে পায়ের আঙুলে ঠুকরে দিয়েছে। আইডিন দেওয়া দরকার। তাই দেওয়া হল।

রামকানাই একবার উঁকি মেরে বলল, 'ওই আরেক খদ্দের এলেন।'

আমি বললাম, 'গরম চা জলখাবার কী আছে এনে দাও।'

রামকানাই গরম চা আর ডিম দিয়ে পাঁউরুটি ভেজে এনে বলল, 'থাকে কখনো ঘরে কিছু? এঁয়ারা যা সব রাক্কস।'

ছোটোমামার খাওয়া শেষ হওয়া অবধি আমরা চুপ করে ছিলাম।

তারপর হাত ধুয়েই বড়ো বড়ো চোখ করে বললেন, 'বুড়ো চিনেছে নাকি আমাকে? তা হলেই তো বাবার কাছে লাগাবে, অমনি সামন্তর পেয়াদারা এসে ধরে নিয়ে যাবে। তাহলে রহস্য উদ্‌ঘাটন কে করবে?'

এই সময় ছোটো মাস্টার টুক করে ঘরে ঢুকে একটা মোড়ায় বসে লজ্জিতভাবে বললেন, 'চুল কাটাচ্ছিলাম পাড়ার সেলুনে। সেখানে বেড়ালের কথা শুনে ছুটে এলাম। ভাবলাম তাহলে হয়তো নেপোকে পাওয়া গেছে। কিন্তু তোমাদের মুখ দেখেই ভুল ভেঙেছে, আর বলতে হবে না।'

ঠক— ঠক— ঠক— ধড়াস্।

ছোটোমাস্টার চমকে উঠলেন। 'দিনরাত ঠান্ডাঘরে কাজ হয়, তবু বাড়ি তৈরি শেষ হয় না কেন?'

ছোটোমামা আঙুল দিয়ে দাড়ি শুকোতে শুকোতে বললেন, 'অন্য কাজ হয়। বাড়ি তৈরির কাজ নয়। ঠান্ডাঘর যদি হবে তো তার বিজলির ব্যবস্থা কই? সুযোগ পেলেই ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াই। এটুকু বুঝেছি যে ওখানে ঠান্ডা করার কোনো ব্যবস্থাই হয় না।'

আমরা বললাম, 'তবে কি স্পেসশিপের কথাই ঠিক? ঠান্ডাঘরটা ছদ্মবেশ?'

ছোটো মাস্টার বললেন, 'তা স্পেসশিপ বানাবে, তারজন্যে অত গোপনীয়তার কী আছে? আমাদের দেশের লোকে মহাকাশযান তৈরি করছে, এ তো ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াবার কথা। লুকিয়ে করবে কেন?'

ছোটোমামা বললেন, 'প্রকাশ্যে করলেই হয়েছে! অমনি প্ল্যান চুরি যাবে, পার্টস্ চুরি যাবে, সরকারি তলব আসবে, স্পেসশিপ বানাচ্ছ তার পারমিট কোথায়, ছবি-সহ দরখাস্ত করো! আমি জানি না? ফালতু জিনিস দিয়ে ঘরে বসে রেডিয়ো বানিয়েই আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে! করতে হলে লুকিয়েই করতে হবে। আপনি যেন আবার এসব কথা ফাঁস করে দেবেন না।'

ছোটো মাস্টার জিব কেটে বললেন, 'না, না, কী যে বলেন! কিন্তু হাজার হাজার বেড়াল এল কোত্থেকে! স্পেসশিপ করতে কি বেড়াল লাগে? মানে লোম-টোমে ইলেকট্রিসিটি— '

নেপোর জন্য বড়ো ভাবনা হল।

গুপি বলল, 'তাও বুঝলেন না? একেবারে ঝপ করে তো আর চাঁদে মানুষ পাঠানো যায় না। প্রথমে এদের পাঠানো হবে।'

—'কিন্তু এতগুলো কেন? দুটো-একটা পাঠালেই তো হয়। তাই তো সব দেশ থেকেই পাঠায়।'

গুপি বলল, 'মানুষের ওজন সইবে কি না সেটাও তো দেখা দরকার। একটা আড়াইমনি মানুষের সমান ওজন নিতে হলে, ক-টি দেড়-সেরি বেড়াল লাগবে বলুন তো? একেবারে এক-শো দেড়-শো মানুষ নিরাপদে যাওয়া-আসা করতে পারবে কি না, তাও তো দেখা দরকার।'

ছোটো মাস্টার তখন জানতে চাইলেন, 'কোথায় রাখা হয়েছিল এত বেড়াল?' আমরা ছোটোমামার দিকে চাইলাম।

গুপি বলল, 'ছোটো করে বল, ছোটোমামা!'

ছোটোমামা বললেন, 'আজ অনেকদিন যাবৎ এই গুরু তদন্তের দায়িত্ব একলা—'

গুপি বলল, 'ছোটোমামা, ফের!'

ছোটোমামা বললেন, 'ওই নকল ঠান্ডাঘরের ওদিকের দেয়ালে, ঠিক গঙ্গার উপরেই দেখলাম একটা বড়ো চোঙার মুখ। কাঠ দিয়ে এঁটে বন্ধ করা। সামান্য কাঠে আমি ভড়কাই না। দুটো মাছওয়ালা রোজ গলি দিয়ে যায়, তাদের কিছু পয়সা দিয়ে রাজি করিয়ে, হাতুড়ি দিয়ে কাঠটি ভাঙালাম। কাঠ ভেঙে যেই-না ওরা মাছের চুবড়ি মাথায় তুলেছে, অমনি চোঙার মধ্যে থেকে সে কী খচমচা খামচি!'

নয়

ছোটোমামা বলতে লাগলেন, 'সে যে কীসের খ্যাঁচম্যাচ সেটা বুঝতে আর বেশি দেরি লাগল না। ঝরনার মতো ঝুপ ঝাপ ধুপ ধাপ করে কেবলই বেড়াল পড়তে লাগল। মাছওয়ালারা একবার তাকিয়েই চুবড়ি তুলে দে দৌড়। আর যাবে কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালের নদীও ছুটল! আমিও কি আর সেখানে থাকি! পাঁইপাঁই লাগালাম। মাছের গন্ধেই বেড়াল বেরিয়েছে। আমি ছোটোবেলা থেকে কড লিভার অয়েল খেয়ে মানুষ, আমাতে আর মাছেতে কতটুকু তফাত তোরাই বল্। ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে কোনোমতে একটা নৌকাতে যদি-বা উঠলাম, সঙ্গেসঙ্গে এই কেঁদো কেঁদো গোটা পঁচিশ বেড়াল। জলে নেমে সাঁতরে কোনোরকমে প্রাণটা হাতে করে ফিরেছি। পানু, আরও পান দে। আর সেই খোঁচা গোঁপ ভদ্রলোক কোথায় উঠে গেলেন? কে উনি?'

তাকিয়ে দেখি, তাই তো ছোটো মাস্টার কখন হাওয়া হয়ে গেছেন। গুপি বলল, 'ওর নাম তলাপাত্র, এম.এ.পাস, বড়ো মাস্টারের শাকরেদ্।'

ছোটোমামা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'কী সর্বনাশ! তবে তো নির্ঘাত ওঁর স্পাই! আর আমি কিনা ওঁর সামনে সব কথা ফাঁস করে দিয়েছি! ই— ই— স্!'

গুপি বলল, 'না, না, ছোটোমামা তোমার সবতাতেই ইয়ে। উনি তোমার বিষয়ে কিছু জানেন না। তা ছাড়া জানলেও কেউ তোমাকে এখন চিনতে পারবে না।'

ছোটোমামা খুশি হয়ে দাড়ি চুমরোতে চুমরোতে বললেন, 'চিনতে পারবে না, না? বাব্বা, ক্যায়সা ছদ্মবেশটা ধরেছি তাই বল! ছোটো মাস্টার ছেড়ে দে, সে তো আমাকে আগে কখনো দেখেইনি, আমার নিজের বাবাই চিনতে পারবে না দেখিস। ভাবছি লোহালক্কড়গুলো কিছু কিছু নিয়ে এসে কাছে রাখি। পানু, তোর খাটের তলায় কিছু রাখলে তোর আপত্তি আছে?'

আমি তো মহা মুশকিলে পড়লাম। সেই যে নিতাই সামন্ত চোরের কথা বলে গেছিল, সেই ইস্তক রোজ রাতে মা একটা বেঁটে লাঠি দিয়ে আমার খাটের তলা খুঁচিয়ে দেখেন। অথচ ছোটোমামা যদি ভাবেন আমি ওঁকে সাহায্য করতে চাই না, তা হলে চাই কী হয়তো চাঁদের দল থেকে আমার নামটাই ছাঁটাই করে দেবেন। তাই বললাম, 'ইয়ে কী বলব, মানে, ইয়ে—'

গুপি বলল, 'না, না এখানে নিতাই সামন্তর বড়ো বেশি আনাগোনা। কে ওদের এক টিকটিকি এসেছে দিল্লি থেকে, সে শুঁকে শুঁকে ফেরারি আসামি বের করে দেয়।'

ছোটোমামা চটে গেলেন, 'আমি ফেরারি হতে পারি, কিন্তু মোটেই আসামি নই। একটু তাড়াতাড়ি চাইছিলাম কারণ অ্যামেরিকানরা এর মধ্যে তিনটে লোক পাঠিয়ে চাঁদে বেড় দিয়ে এসেছে, এবার নাকি লোক নামাবে। এর পরে আর ওখানে জমিটমি পাওয়াই যাবে না।'

গুপি বলল, 'আমাদের হেডস্যার বলেছেন যে রাশিয়ানরা হয়তো এর আগেই ওখানে ঘাঁটি গেড়ে ফেলেছে—।'

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি তোর দূরবিন দিয়ে স্পষ্ট দেখেছি, জিনিস বোঝাই নৌকো চাঁদে যাচ্ছে।'

গুপি বলল, 'না রে না, দূরবিনের কাচে কে একটা ছোট্ট খেলনা আটকে দিয়েছে, তাতে খুদে একটা নৌকো জলের মতো জিনিসে ভাসে, মনে হয় বুঝি সত্যি! কিন্তু অ্যামেরিকানরা চাঁদে নেমে যদি দেখে রাশিয়ানরা আগেই সেখানে ঘরবাড়ি করে ফেলেছে, তাহলে বেশ মজা হয়।'

এমনি সময় ছোটো মাস্টার আবার ফিরে এসে মোড়ায় বসেই বললেন, 'চোঙা লোহার ঢাকনি দিয়ে কে বন্ধ করে দিয়েছে। ওই দিক দিয়ে ঢোকা যাবে না।'

ছোটোমামা চমকে উঠে বললেন, 'কেন ঢোকা যাবে না? কিন্তু ঢুকবে কে?'

ছোটো মাস্টার ছোটোমামার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন, রোগাপানা সাহসী কেউ ঢুকবে।'

ছোটোমামা বললেন, 'খুব বেশি রোগা হওয়া চাই নাকি?'

ছোটো মাস্টার কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, 'আমার চেয়ে রোগা কেউ। দাড়ি থাকলে ক্ষতি নেই। বরং চোঙার ভেতরে নরম লাইনিং-এর কাজ করবে।'

ছোটোমামা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাবা দাড়ি রাখা পছন্দ করেন না, ওটা চেঁচে ফেলব ভাবছি।'

ছোটো মাস্টার বললেন, 'বাবা তো শুনেছি পড়াশুনো ফেলে, লোহালক্কড়ের সন্ধানে ঘোরাও পছন্দ করেন না। তবে সাহস না থাকলে কেই-বা চোঙার মধ্যে ঢুকবে বলুন? কোথায় কী আছে কে জানে।'

ছোটোমামা উঠে পড়েছিলেন, আবার বসে পড়ে বললেন, 'কী আবার থাকবে? স্পেসশিপের গুপ্ত কারখানা আছে। বাইরের লোক ঢুকলে মাথায় হয়তো স্প্যানার মারবে।'

ছোটো মাস্টার বললেন, 'কিন্তু বেড়ালরাও ছিল মনে রাখবেন। এ-কাজে বেড়ালের চেয়ে মানুষ পেলে অনেক ভালো হয় না কি?'

ভালো করে ওদের কথার মানে বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু দেখলাম ছোটোমামার চোখ দুটো হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। কীরকম চাপা গলায় বললেন, 'মানুষ। চাঁদে নামার প্রথম মানুষ! ই-স্!' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা বাঁকিয়ে বললেন, 'কিন্তু লোহার ঢাকনি আঁটা বললেন যে?'

ছোটো মাস্টার বললেন, 'আহা, বাইরে থেকে রিভেট করা। ওস্তাদ লোকের পক্ষে সে আর এমন কী। তা ছাড়া আমার মনে হয়—'

ছোটোমামা বললেন, 'কী মনে হয়?'

—'আজ রাতে রিভেট খোলা থাকতেও পারে। যা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।'

ছোটোমামা বললেন, 'চলি। এবেলা ডিউটি আছে।'

কেমন যেন ওঁকে দেখতে অনেক লম্বা অনেক ষণ্ডা অনেক লোমশ মনে হচ্ছিল। আমার শার্ট-প্যান্ট পরেই চলে গেলেন। উৎসাহের চোটে আমার পায়ে বেজায় ঝিঁঝি ধরে গেল। অথচ দশ দিন আগেও পায়ে কিছু টেরই পেতাম না। শেষটা হয়তো চাঁদে গিয়ে কোনো অসুবিধাই হবে না। এই সময় ছোটোমামা ফিরে এসে বললেন, 'একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। গুপি, শোবার সময় জানলা একটু খুলে রাখিস। তেমন তেমন হলে, পায়রা গিয়ে খবর দেবে।' বলেই সুড়ুৎ করে চলে গেলেন। আমরা অবাক হয়ে গুপির দিকে চাইলাম।

গুপি বলল, 'আমরা কয়েকটা পায়রা পুষে আমাদের বাড়ি আর দাদুদের বাড়ির মধ্যে খবর দেওয়া-নেওয়া করি। ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ি পায়রা, দিব্যি পকেটে পুরে রাখা যায়। একটা পায়রা ছোটোমামাকে এনে দিয়েছি। সেটার কথাই বলছেন।'

ছোটো মাস্টার এমন কথা কখনো শোনেননি। বললেন, 'উনি থাকেন কোথায়?'

গুপি আমার দিকে চেয়ে একটু মাথা নাড়ল। ছোটো মাস্টার লজ্জা পেয়ে বললেন, 'জানি অবিশ্যি আপাতত ছাপাখানায় চাকরি নিয়ে সেখানেই বসবাস করেন। ভালো খানদান, কিন্তু সবসময় এত ঘোরাঘুরি করেন যে গায়ে মাংস লাগে না। শুনেছি এক তলা থেকে পাঁচ তলা অবধি দিনের মধ্যে পঁচিশ বার ওঠা-নামা করেন। বড়ো স্যার বারি চটা ওঁর উপর। তবে উনিই যে গুপির ফেরারি ছোটোমামা এটা জানা ছিল না। সাহসী বটে।'

ছোটো মাস্টার উঠে দাঁড়াতেই, গুপি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'বড়ো মাস্টারকে ছোটোমামার কথাটা বলবেন না কিন্তু স্যার, তাহলে সব ভেস্তে যাবে। শেষটা হয়তো আমাদেরও চাঁদে যাওয়া হবে না!'

ছোটো মাস্টার বললেন, 'না, না, কোন কথাটা আমি তাঁকে বলেছি? তবে চাঁদুকে তাড়াতাড়ি চাঁদে যেতে বল। কারণ সত্যিই এ-বছরেই অ্যামেরিকানরা গিয়ে হয়তো সেখানে ব্যাবসা ফাঁদবে। তারপর পারমিট পাওয়াই এক মহা সমস্যা হবে।'

ছোটো মাস্টার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে, গুপি বলল, 'নারে পানু, কাজটা খুব ভালো হল না। ছোটোমামা চোঙায় ঢুকতে গিয়ে না আবার কোনো ফ্যাসাদে পড়ে। সাহসী হলে কী হবে। মাকড়সা, টিকটিকি, এমনকী ব্যাং দেখলেও ওর হাঁটু বেঁকে যায়। শেষটা চোঙায় ঢুকে না আটকে থাকে। তা ছাড়া ছোটো মাস্টার কী করে ছোটোমামার ডাকনাম জানল? নিশ্চয় তোদের কাছে শুনেছে। তোরা বড্ড কথা বলিস। এসব ব্যাপারে ছোটো মাস্টারের এত কীসের মাথাব্যথা তা বুঝলাম না।'

গুপি চলে গেলে, অনেকক্ষণ বসে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম বড়ো মাস্টার হাত নেড়ে বউকে কী বোঝাচ্ছেন আর বউ ঘন ঘন মাথা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে। কিছুদিন আগে বড়ো মাস্টারের বউ পোড়ার লোমহর্ষক কাহিনি শুনেছিলাম। বড়ো মাস্টার-ই বলেছিলেন। ঠিক যেন পরিদের গল্প। বর্মার ঘন জঙ্গলে বড়ো মাস্টারের বাবা সেগুন গাছের ইজারা নিয়েছিলেন। সেখানে যত সেগুন গাছ ছিল সব তাঁর কেটে আনার অধিকার ছিল। কিন্তু বনে গিয়ে সে গাছের শোভা দেখে আর কাটতে ইচ্ছা করত না। ভাবলেন তার চাইতে বড়ো বড়ো ডাল কেটেও তো কাজ চালানো যায়।

সারাদিন বনে বনে ঘুরেছেন। সঙ্গের লোকেরা অনেক ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিক ছায়া-ছায়া থমথম করছে। লোকের মুখে শোনা নানারকম ভয়ের গল্প মনে পড়ছে। তার উপর ওই বনে বিখ্যাত ডাকাতের সর্দার রামুর কথাও মাঝে মাঝে কানে আসত। মাস্টারমশাইয়ের বাবা ভাবছিলেন অশরীরীদের চেয়ে বরং ডাকাতের সর্দারই ভালো। এমন সময় করুণ কান্নার শব্দ কানে এল।

মাস্টারমশাইয়ের বাবা চমকে উঠলেন। তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধি থাকলেও, মনটা তাঁর বড়ো নরম ছিল। কান্না শুনে আর থাকতে না পেরে খোঁজাখুঁজি লাগিয়ে দিলেন। হঠাৎ মনে হল তাঁরই একটা সেগুন গাছের তলা আলো করে কে যেন বসে হাপুসনয়নে কাঁদছে। কাছে গিয়ে দেখেন সাত-আট বছরের একটি ছোট্ট সুন্দর মেয়ে, দুধে-আলতা গায়ের রং, আঙুরের থোপার মতো কোঁকড়া চুল। কার মেয়ে কোথায় বাড়ি কিছু বলতে পারে না।

জিজ্ঞাসা করলেই মা-মা বলে কাঁদে।

বাবা তাকে অভয় দিয়ে, সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এলেন। মাস্টারমশাইয়ের মা ছিলেন না, কিন্তু বুড়ি পিসি ছিলেন। তিনিই অনেক যত্নে ওই মেয়েটিকে মানুষ করে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। সবাই তখন মানা করেছিল, বলেছিল বন থেকে কুড়িয়ে-আনা মেয়ে, কে জানে দৈত্যদানোর ঘরের কি না। কিন্তু পিসিমা কারো কথা শোনেননি।

তারপর বউয়ের একটু বয়স হলে রাতে বাড়িতে নানান উপদ্রব হতে লাগল। বাইরে থেকে কারা গোরু-ছাগল চুরি করে। কারা যেন ছোরা ছুড়ে মারে। শেষটা বউ একদিন আর থাকতে না পেরে সব ফাঁস করে দিলে। সে আসলে রামু ডাকাতের নাতনি। রামুই ওকে বনের মধ্যে ওইভাবে ফেলে রেখেছিল। যাতে বড়ো হয়ে মাস্টারমশাইয়ের বাবার বাড়ি থেকে ধনরত্ন নিয়মিত পাচার করতে পারে। এইরকম অনেক ছেলে-মেয়েকে রামু এবাড়ি-ওবাড়ি পাচার করে, ফলাও করে ডাকাতি ব্যাবসা চালাত। এতে করে মাসে গড়ে হাজার দুই উপায় হত।

কিন্তু মুশকিল হল যে পিসির উপর মাস্টারমশাইয়ের বউয়ের বড়ো টান। কিছু পাচার করা দূরে থাকুক, এতটুকু শব্দ শুনলেই হাঁউমাউ করে ওঠে। শেষে ওর জন্যেই দলের দু-চারজন ধরাও পড়ল। তখন রামুর দল ওদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সে অঞ্চল থেকে সরে পড়ল। ওই আগুনে জিনিসপত্রের অনেক ক্ষতি হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রাণে কেউ মরেনি। দুঃখের বিষয় বউয়ের মুখের এক দিকটা ঝলসে গেছিল। সেই অবধি বউ আর কারো সামনে বেরোয় না। কিন্তু পিসিদের বাঁচাতে গিয়েই বউয়ের এই দশা, তাই হাজার খিটখিটে হলেও মাস্টারমশাই ওর যত্ন করেন। পিসি তো ওর কোলেই মাথা রেখে নব্বুই বছর বয়সে স্বর্গে গেছেন।

গল্প শুনে গুপির আর আমার খুব দুঃখ হয়েছিল। বউয়ের জন্যে গুপি কিছু ফুল এনে দিয়েছিল। মাস্টারমশাই খুব খুশি হয়েছিলেন মনে হল।

তবু রোজ রোজ এত কীসের তর্কাতর্কি ভেবে পেলাম না। আগে এমন ছিল না। জানলা দিয়ে শুধু বউয়ের ঘোমটাপরা মাথাটুকু দেখা যেত। আজকাল মনে হয় বেশ ঘুসি পাকিয়ে মাস্টারমশাইকে ভয় দেখাচ্ছে।

তার পরদিন বিকেলে ছোটো মাস্টার আমাকে হাতের কাজ শেখাতে এসে বললেন, 'চাঁদে যাবার রকেটের এই মডেলটা বানিয়েছি দেখো।'

আমি তো অবাক। সব আছে দেখলাম। লঞ্চিং প্যাড পর্যন্ত। নাকি সত্যি ওড়ানো যায়। তবে খোলা জায়গা দরকার।

আমি বড়ো মাস্টারের ঘরের সামনে খোলা ছাদের দিকে তাকিয়ে বললাম, ওইখানে যেতে পারলে বেশ হত।'

ছোটো মাস্টার একটু যেন থতোমতো খেয়ে গেলেন। হঠাৎ বললেন, 'ছোটোমামার কাছ থেকে কি কোনো খবর আসেনি?'

আমি বললাম, 'না তো।'

—'মানে তিনি আছেন তো?'

আমি আঁতকে উঠলাম। আছেন তো আবার কী? কতসময় তাঁকে দিনের-পর-দিন দেখা যায় না। ইচ্ছা করেই উনি গা ঢাকা দিয়ে থাকেন, যাতে পুলিশের নজরে না পড়েন।

ছোটো মাস্টার হাত থেকে মডেলটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'কিন্তু চোঙার মুখের ঢাকনিটা কাল রাত থেকেই খোলা।'

আমি চমকে উঠলাম। 'সে কী! তাহলে কি ছোটোমামা—। নাঃ, উনি তো রাতে বেরুতে ভয় পান।'

ছোটো মাস্টার হাসলেন, 'উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে ভয়-ডর টেকে না, তাও জান না। ভদ্রলোক কোনোরকম বিপদে-টিপদে পড়েননি তো? এক রকম আমার কথাতেই চোঙায় সেঁদোলেন।— আচ্ছা আজ ঠক-ঠক শব্দটব্দ কিছু শুনেছ কি?'

তাই তো! আজ তো ঠান্ডা ঘর একেবারে চুপ। তাকিয়ে দেখলাম বড়ো মাস্টারের নাইট স্কুলের শেডে একটা নোটিস লটকানো রয়েছে!

ছোটো মাস্টার বললেন, 'আজ স্কুল বন্ধ। বড়ো স্যারের বাড়িতে নাকি কী গোলমাল হয়েছে। বউটিকে কিন্তু বড়ো বদ্‌মেজাজী মনে হয়। যদিও খাসা রাঁধে। ঙাপ্পি খেয়েছ কখনো?'

আমি বললাম, 'ওয়াক্ থুঃ'!

ছোটোমাস্টার চটে গেলেন। 'ও আবার কী হল? যে-জিনিস সম্বন্ধে কিচ্ছু জান না, তাকে ওয়াক থুঃ করার কোনো মানে হয় না। খুব ভালো জিনিস। এক থালা ভাতে এক চিমটি মাখলেই অমৃতের মতো লাগে। বড়ো স্যারের নিজের মুখে শোনা। ছাদের ঘরে ওঁর বউ ঙাপ্পি বানায়। ফুলের টবের মাটিতে পুঁতে রাখে। একদিন একটু চেয়ে নেব।'

তারপর ছোটো মাস্টার যাবার জন্যে তৈরি হয়ে বললেন, 'নাঃ, মনটা বড়ো খুঁতখুঁত করছে। গুপির দূরবিনটা দাও তো একটু দেখি।'

অনেকক্ষণ দেখলেন। সব ভোঁ-ভাঁ। ছাদে সেই ছোটো ছোটো সাদা-কালো জানোয়াররাও চরছে না, তা সে পেঙ্গুইন-ই হোক, কি বেড়ালই হোক। শেষটা দূরবিন নামিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছোটো মাস্টার চলে গেলেন।

যেই-না সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়েছেন, দরজা তখনও ভালো করে বন্ধ হয়নি, খাবারঘরের মধ্যে দিয়ে গুপি এসে হুড়মুড় করে ঢুকে বলল, 'পানু, সর্বনাশ হয়েছে!'

দশ

গুপি পকেট থেকে কিলবিলে গোলাপি রঙের কী একটা বিশ্রী জানোয়ার আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবলি হাঁপাতে লাগল। আমার তো চক্ষুস্থির। মনে হল নতুন ধরনের ব্যাং। আমি আবার ব্যাং দেখতে পারি না। তাই বলে যে ভয় পাই তা যেন কেউ মনে না করে। খুদে একটা গোলাপি ব্যাং; তাও যদি মস্ত পায়রাখেকো ব্যাং হত। ফেলেই দিচ্ছিলাম কোল থেকে, এমন সময় ছোটো মাস্টার আবার ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওর পায়ে বাঁধা ওটা কী?'

বলে আমার কোল থেকে ব্যাংটাকে তুলে নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলেন। বাঁ-পায়ে ছোট্ট একটা অ্যালুমিনিয়ামের খাপের মতো। ব্যাংটা থরথর করে কাঁপছিল। মাঝে মাঝে কালো ঠোঁট দুটো খুলছিল আর বন্ধ করছিল। ভারি অদ্ভুত লাগল। ব্যাঙের আবার ঠোঁট হয় জানতাম না।

গুপি গোল গোল চোখ করে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে, বলল, 'ওটা ব্যাং নয়, ও আমাদের বার্তাবাহী পায়রা, বিদ্যুৎ।' বলে কী! পায়রা কখনো ব্যাঙের মতো হয়? গুপি বলল, 'হয় হয়। সব জানোয়ারের লোম ছাড়ালেই ব্যাঙের মতো। মানুষও। আমার ছোটো বোনটা একেবারে ব্যাঙের মতো, শুধু একটু বড়ো, এই যা।'

ছোটো মাস্টার ততক্ষণে পায়ের খাপটা খুলে ছোটো একটা চিঠি বের করে ফেলেছেন। চিঠি খুলে চমকে উঠে সেটা গুপিকে দিলেন। গুপিও চিঠি পড়ে দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠে, আমাকে দিল। দেখি ফিকে পেনসিল দিয়ে লেখা, 'গুপে চলে আয়। লোমহর্ষক ব্যাপার।' নামটাই নেই।

ছোটো মাস্টার বললেন, 'চাঁদুর লেখাই তো?'

গুপি বলল, 'সে আর বলতে হবে না। অমন খারাপ হাতের লেখা আর কার হবে?'

ছোটো মাস্টার বললেন, 'কিন্তু কোথায় চলে যেতে হবে? একেবারে শত্রুর খপ্পরে পড়ে যাবি না তো? ওরা যদি চিঠির কথা না-ই জানবে তো পায়রার পালক ছাড়াল কে?'

গুপি বলল, 'তাই তো, যে পালক ছাড়িয়েছে, সে খাপটাকেও দেখেছে। আর খাপ দেখেছে যখন তখন কি আর চিঠি খুলে পড়েনি। পড়ে আবার গুঁজে রেখেছে। যাতে সবাইকে একসঙ্গে ধরতে পারে। কে জানে ছোটোমামা এতক্ষণ বেঁচে— !' গুপি থেমে গিয়ে মুখ ঢাকল। হঠাৎ আমি হেসে উঠলাম। ওরা তো অবাক।

ছোটো মাস্টার ভারি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'একটা মানুষের মরণ-বাঁচন সমস্যা আর তোমার কি না হাসি পাচ্ছে!'

খুব লজ্জা পেয়ে বললাম, 'না, না, সেজন্যে নয়, তা ছাড়া ছোটোমামা যে সহজে মরবে না সেটা ঠিক। আমি হাসছিলাম কারণ নেপো যে বেঁচে আছে সেটা এবার প্রমাণ হল। পাখি ধরতে পারলেই ও তাদের পালক ছাড়ায়। পায়রা যেখান থেকে এসেছে, সেখানে নেপোও আছে।'

গুপি বলল, 'তার মানে সেখানে ছোটোমামাও আছে। চলুন, ছোটো স্যার, তাকে উদ্ধার করতে হবে। বিপদ-আপদ দেখলে ছোটোমামার দাঁত-কপাটি লেগে যায়।'

ছোটো মাস্টার কাষ্ঠহেসে বললেন, 'তাহলে চাঁদে যাবার খুবই উপযুক্ত পাত্র দেখছি। তুমি বরং এগোও, আমি একটু কাজ সেরে আসছি।'

গুপি বলল, 'কার কত সাহস বোঝাই যাচ্ছে।'

ওই ওর দোষ, অল্পতেই রেগে যায়।

ছোটো মাস্টার কিছু মনে করলেন না। তা ছাড়া বড়ো মাস্টারের কাছে তো দিন-রাতই এই ধরনের কথা শোনেন। নরম গলায় বললেন, 'মন্দ বলনি। দু-জনে গেলে বেশি কাজ দেবে। তাহলে তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা করো, আমি কাজ দুটো সেরে আসি। ততক্ষণে এই বইটা থেকে চাঁদের বিষয়ে আরও কিছু তথ্য শেখো, কেমন?'

এই বলে ছোটো একটা বই আমার হাতে দিয়ে ছোটো মাস্টার একরকম ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

ভারি ভালো বইটা। নাম 'চাঁদের রহস্য'। খুলে দেখলাম লেখা রয়েছে সম্ভবত সাড়ে চার-শো কোটি বছর আগে গ্যাস আর ধুলো একসঙ্গে জমে চাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল, এইরকম মত কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ পোষণ করে থাকেন। অর্থাৎ চাঁদ পৃথিবীর চেয়েও পুরোনো। কেউ কেউ আবার বলেন পৃথিবীর টুকরো ছিঁড়ে উড়ে গিয়ে চাঁদ তৈরি হয়েছে।

চাঁদ নিজের অক্ষ দণ্ডে ২৭ $\frac{১}{৩}$ দিনে এক বার পাক খায়। পৃথিবীর চারদিকে ২৯ ঘণ্টা ৪৪ মিনিটে এক বার ঘুরে আসে। চাঁদের ব্যাসের মাপ ৩৪৫৬ কিলোমিটার। মাঝে মাঝে চাঁদে রঙের পরিবর্তন দেখা যায়, তার কারণ সম্ভবত নিবে-যাওয়া আগ্নেয়গিরির গহ্বর থেকে গ্যাস বেরোয়।

এই অবধি পড়ে গুপি বইটাকে ছুড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে, ঘরময় পাইচারি করতে লাগল। দেখলাম মুখটা খুব লাল। বোধ হয় কান্না চাপছিল। ঠিক সেই সময় হন্তদন্ত হয়ে ছোটো মাস্টার ফিরে এসে বললেন, 'গুপি, চল।'

তারপর একটা ছোট্ট কার্ডে একটি গোপন টেলিফোন নম্বর লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'যদি দেখো রাত দশটার মধ্যেও আমরা কেউ ফিরে এলাম না, তাহলে এই নম্বরে ফোন করে শুধু বলবে— ফুস্-মন্তর, ব্যস্ আর কিছু নয়। কার্ডটি তখুনি ছিঁড়ে ফেলো আর কখনো কাউকে বোলো না।' বলিওনি কাউকে, তা ছাড়া এখন ভুলেও গেছি। অবিশ্যি ফোন করার দরকার-ও হয়নি। কার্ডটাকে ছিঁড়েও ফেলেছি।

ওরা চলে গেলে পর আমার নানান কথা মনে হতে লাগল। পা দুটোর উপর এমনি রাগ হতে লাগল যে আর কী বলব। তার উপর রামকানাই এসে ইনিয়েবিনিয়ে ওর পিসেমশাইয়ের কত বার কী অসুখ হয়েছিল তাই বলতে লাগল। ওকে বললাম, 'জান, নেপো বেঁচে আছে।'

রামকানাই তো অবাক। 'ওকী কথা পানুদা, যারা অনেকদিন সগ্‌গ ভোগ করছে, তাদের বিষয় অমন কথা বলতে হয় না। অবিশ্যি সগ্‌গ কি না সে বিষয়েও ঠিক বলা যায় না।'

আমি বললাম 'না, রামকানাইদা, না। নেপো ছাড়া কে বিদ্যুতের পালক ছাড়িয়েছে বলো।' বুক পকেট থেকে বিদ্যুৎকে বের করে দেখালাম। রামকানাই তো হাঁ।

হঠাৎ বড়ো মাস্টারের জানলার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। ঘরে আলো জ্বলছে না। এই বাড়িতে আমরা চার বছর আছি, কখনো ও-ঘর অন্ধকার দেখিনি। যেই-না সূর্য ডোবে ও-ঘরেও বাতি জ্বলে। একবার অনেকক্ষণ পাড়ার আলো নিবে গেছিল। নেবার সঙ্গেসঙ্গে ও-ঘরে মোমবাতির আলো দেখতে পেয়েছিলাম। বউ বোধ করি অন্ধকারকে ভয় পায়। অথচ একদিন ওই বউই বনে বাস করত।

জানলার কাছে গিয়ে দেখলাম ছাপাখানার আর ঠান্ডাঘরের কোনো আলোই জ্বলছে না। নীচে বড়ো মাস্টারের নাইট স্কুলের শেডের সামনের বড়ো আলোও নেবানো। কোথাও একটা লোক দেখা যাচ্ছে না। তবু আমার ঘরে বসেই টের পাচ্ছিলাম যে ওই দুটো বাড়িতে সাংঘাতিক কিছু একটা পাকিয়ে উঠছে।

রামকানাইকে বললাম, 'তুমি এক বার যাও-না, গুপি আর ছোটো মাস্টারের সাহায্য দরকার হতে পারে।'

রামকানাই ফোঁস করে উঠল, 'ও বাবা, সে আমি পারব না। কেউটে সাপের বাসায় নাক গলানো আমার কম্ম নয়। তা ছাড়া আমি গেলে তোমার দেখাশুনো করবে কে! তোমাকে একা ফেলে যাই, আমার চাকরিটাও যাক আর কী। যাই, মাংসটা চাপিয়ে এসেছি।' এই বলে রামকানাই সত্যি সত্যি দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজার কাছে পৌঁছে, ফিরে বলল, 'কোনো ভয় নেই, ওই যে সামন্তবাবুও একদল প্যায়দা নিয়ে গলিতে ঢুকল। যাই, মাংস না ধরে যায়। চোর ধরার চেয়ে সে অনেক খারাপ হবে।'

আরও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। রামকানাই একবার উঁকি মেরে দেখতে এল কী করছি। বললাম, 'সব শুনেও নেপোকে খুঁজতে যাবে না?'

রামকানাই বলল, 'না, আমার গুরুদেব শুনলে দুঃখিত হবেন!' এই বলেই চলে গেল। একটু পরে আবার এসে বলল। 'অত নেপো-নেপো করো কেন? মহা পাজি বেড়াল। অমন ঢের ঢের বেড়াল পাওয়া যায়। চাও তো দুটো-একটাকে এনেও দিতে পারি।' চাঁদের বইটা ছুড়ে মারলাম। সঙ্গেসঙ্গে সে কী চিৎকার!! শুনে আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠল। মনে হল কে চ্যাঁচাচ্ছে, 'পানু— পানু— পানু— ওরে পানু— বাঁচা— রে! মি—অ্যাঁ—ও মি—অ্যাঁও।' আর এক মিনিটও অপেক্ষা করলাম না, পাঁই পাঁই গাড়ি চালিয়ে একেবারে পেছনের বারান্দার ঘোরানো সিঁড়ির মুখের

কাছে চলে গেলাম। মনে হল ওদিকে ওদের ঘোরানো সিঁড়ির মাথার দরজাটায় কারা যেন আছড়ে পড়ল। 'পানু— পানু— বাঁচা।' আর সে কী ম্যাঁও-ম্যাঁও শব্দ।

—'ও রামকানাই দা! ও রামকানাই দা!' বলে চ্যাঁচাতে লাগলাম। উত্তর নেই। হঠাৎ দেখি রঙের মিস্ত্রিদের তক্তাটা আমাদের রেলিঙের ধারে পড়ে আছে। এক মাথা সিঁড়ির রেলিঙে বাঁধা। নিশ্চয় গুপির কাজ। হাত বাড়িয়ে সেটাকে তুলে নিলাম। বেশ ভারী। গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ির রেলিঙের ফাঁক দিয়ে ঠেলে ঠেলে যেই-না ওদের সিঁড়ির সঙ্গে জুড়ে দিলাম, অমনি ওদিকের দরজা খুলে হুড়মুড় করে দাড়িওয়ালা একটা লোক বেড়াল বগলে তক্তা পেরিয়ে চলে এল। সঙ্গেসঙ্গে গুপি এসেই তক্তা টেনে নিল। কিন্তু ততক্ষণে আরও গোটা দশেক বেড়াল আমাদের বারান্দায় এসে উঠেছে। উঠেই কার্নিশ বেয়ে হাওয়া।

আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম। এবার উঠে গাড়িতে চেপে খাবার ঘরে এলাম। গুপি বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমি কেবল বলতে লাগলাম, 'ওরে নেপো! আবার ফিরে এসেছিস!' আর নেপো আমার কোলে উঠে কেবলই আমাকে চাটতে লাগল। নেপোর গলায় দেখলাম একটা সাদা টিকিট ঝুলছে। তাতে লেখা— A।

ছোটোমামা আর গুপি আমার বিছানায় বসে বসে খালি হাঁপাতে লাগল। তাদের মুখগুলো কাগজের মতো সাদা, হাত-পা কাঁপছে।

রামকানাইকে কিছু না বলতেই ওদের জন্যে গরম চা আর নেপোর জন্যে বাটি করে দুধ নিয়ে এল। টানতে টানতে নেপোকে আমার কাছ থেকে নিয়ে দুধের বাটির সামনে বসিয়ে দিল এবং বলা বাহুল্য নেপোও তৎক্ষণাৎ দুধের সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেল।

এমন সময় দরজা ঠেলে মেজোকাকু ঢুকেই, ওদের দেখে বললেন, 'এই যে তোমরা এখানে! ওটা কে? চাঁদু না? তুই আবার দাড়ি রেখেছিস কেন? চেঁচে ফেল্, বিশ্রী দেখাচ্ছে, স্রেফ আইন-ভঙ্গকারী! তোরা এখানে কী কচ্ছিস? এদিকে পাশের বাড়িতে বিনু তালুকদার যে কেল্লা ফতে করে দিয়েছে তাও জানিস না বুঝি? চাঁদু, এবার তুই বাড়ি ফিরে নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনো করগে যা। বুড়ো বাপকে আর জ্বালাস নি।'

গড়গড় করে কী যে বকছেন কাকু আমি ভালো করে বুঝতেই পারছিলাম না। কিন্তু গুপি আর ছোটোমামা কোনো কথা না বলে পাশাপাশি আমার খাটের উপর শুয়ে পড়ল। কাকু ব্যস্ত হয়ে রামকানাইকে বললেন, 'হাঁ করে বসে আছিস যে? ও-দুটোর দাঁতকপাটি লেগেছে দেখছিস না? মাথায় জলের ঝাপটা দে!'

কিন্তু রামকানাইয়েরও এমনি হাত-পা কাঁপছিল যে সেও নড়তে পারছিল না। শেষপর্যন্ত আমিই তাক থেকে কুঁজো নামিয়ে জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম। তাই দেখে কাকু আবার ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'অ্যাঁ! তু-তু-ই হাঁটছিস্!'

তাই তো, দিব্যি হাঁটাহাঁটি করছি, এতক্ষণ তো টের পাইনি! বাবাও এসে ঘরে ঢুকে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কেন জানি হাঁউ মাউ করে কেঁদে ফেললাম। বাবাও নাক টানতে টানতে আমার হাত ধরে আবার বসিয়ে দিলেন। পকেটে বোধ হয় চিপকে গিয়ে বিদ্যুৎ বক-বকম করে উঠল। মা এসে কিছু না বলে মহা কান্নাকাটি লাগালেন। এ তো বড়ো জ্বালা।

অনেক পরে বাবা বললেন, 'ডাক্তারবাবুকে ফোন করে দেওয়া হয়েছে, এখুনি আসবেন। বললেন এইরকম একটা উত্তেজনারই দরকার। কিন্তু এরা দু-জন এখনও ভিজে বালিশে শুয়ে কেন? সর্দি লাগবে না?'

গুপি আর ছোটোমামার দু-জনারই সর্দির বড়ো ভয়। বাবার কথা শুনেই তড়াক করে উঠে বসে আমার তোয়ালে দিয়ে তারা মাথা মুছতে লেগে গেল।

তারপর বাবা মেজোকাকুকে বললেন, 'কী ব্যাপার খুলে বল দিকিনি।'

কাকু বললেন, 'নিতাই সামন্ত এক্ষুনি এল বলে, এদের স্টেটমেন্ট নিতে। তার কাছেই সব শুনো। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। নিতাই ফোন করে বলল তোমার বাড়ি থেকে পাখি যেন না পালায়। তাই এলাম।'

একথা যেই-না বলা, ছোটোমামা আর গুপি দু-জনাই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। মেজোকাকু বললেন, 'ও কী হচ্ছে? ওসব চলবে না। চুপ করে বসে থাকো। আমি কথা দিয়েছি সে না আসা অবধি তোমাদের এখানে আটক রাখব।'

গুপি বলল, 'কী, কী করে জানলেন আমরা এখানে?'

মেজোকাকু তো অবাক! 'কী করে জানলাম? শুধু আমি না, পাড়াসুদ্ধ যত লোক অন্ধকার গলিতে খাপে দাঁড়িয়েছিল, সবাই দেখেছে তক্তা পার হয়ে দু-জন আইনভঙ্গকারী এখানে আশ্রয় নিচ্ছে। খবরদার যদি নড়েছ!! আর সামন্ত আসার আগে ঠোঁট ফাঁক করবে না। তোমরাই পুলিশের সবচেয়ে বড়ো সাক্ষী। ভিতরের ব্যাপার স্বচক্ষে দেখে এসেছ। ছোটো মাস্টার কোথায়? যাকগে, পুঁটিমাছ বোধ হয় বিনু তালুকদারের জালে পড়েছে।'

এই বলে মেজোকাকু বেদম হাসতে লাগলেন। খুব রাগ হল!

তারপর গম্ভীর মুখ করে ছোটোমামার দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি সত্যি এর মধ্যে জড়িয়ে আছ দেখে বড়ো দুঃখিত হলাম। তোমার বাবা এত ভালো লোক, গেলেই কী ভালো তামাক খাওয়ান। তবে নিতাই সামন্ত যেই তোমার ঘরে চোরাই গাড়ির নম্বর প্লেট পেয়েছিল, তখনই সব আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তুমি দুষ্টুলোকের—'

ছোটোমামা হঠাৎ রেগে গেলেন। 'ওসব আমি গোমেস ব্রাদার্স থেকে সের দরে কিনেছি, তার ভাউচার আছে মার হাতবাক্সে, গিয়ে দেখতে পারেন।'

শুনে মেজোকাকু অবাক!

বাবা হেসে বললেন, 'ও হো, তোকে বলা হয়নি। চাঁদু যে স্পেসশিপ বানিয়ে গুপি আর পানুকে চাঁদে নিয়ে যাবে। সেখানে জমি কিনে ওরা স্পেসশিপ সারাবার কারখানা করবে। দ্যাখ চাঁদু, মাটির তলার জমি কিনিস কিন্তু, ওপরের জমি বাজে। হ্যাঁ কী বলছিলাম, তা চাঁদে যাবার খরচা কম নয়, ওরা পারবে কেন? তাই চাঁদু নিজেই স্পেসশিপ বানাবে। তাই নিয়ে এত ভাবতে হয় যে পড়া করার সময় পায় না। ফলে বি.এস্‌সি.-তে সুবিধা করতে পারে না।'

এই অবধি বলে বাবা আর মেজোকাকু যে-যার নিজের হাতঘড়ি দেখলেন। মেজোকাকু জানলার কাছে গিয়ে বললেন, 'দশটা বাজতে দশ মিনিট, আমাদের সকলের জন্যে রাঁধতে দিয়েছ আশা করি, বড়দা?'

রামকানাই দরজার কাছ থেকে বলল, 'খিচুড়ি, মাংস, আলুভাজা, বেগুনভাজা।'

গুপি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। আমি বললাম, 'ছি, মেজোকাকু, তোমার শুধু খাওয়ার ভাবনা।'

গুপি আর ছোটোমামা একসঙ্গে বলল, 'খাওয়ার ভাবনা খারাপ নাকি? উঃ পেটে চড়া পড়ে গেছে!'

ডাক্তারবাবু এলেন। আমার পা পরীক্ষা করলেন। হাঁটালেন, চলালেন, ওঠ-বোস করালেন! তারপর ওষুধপত্র মালিশের ব্যবস্থা করে দিয়ে বললেন, 'পানু, এও তোমার একরকম পরীক্ষা

শেষ হল। তুমি খুব ভালো ভাবে পাস করেছ। এক মাস এক্সারসাইজ করবে, বাড়াবাড়ি করবে না! তারপর স্কুলে যেতে পারবে। কেমন, খুশি তো?'

আমার খুব সর্দি এসে গেল, কিছুই বলতে পারলাম না।

এমন সময় নিতাই সামন্ত এসে ঢুকলেন। সবাই চুপ।

মেজোকাকু একটু কেশে বললেন, 'এই যে কানু, তোমার সাক্ষী-সাবুদ, অনেক কষ্টে আটকে রাখা গেছে।'

বাবা বললেন, 'তা ছাড়া অবিশ্যি দৌড়ঝাঁপ করার মতো ওদের ক্ষমতাও নেই।'

ছোটোমামা ভাঙা গলায় বললেন, 'দু-দিন খাইনি। খাঁচায় বন্ধ করে রেখেছিল।'

নিতাই সামন্ত বললেন, 'তাই নাকি? ভাগ্যিস গুপিরা গেছিল।'

ছোটোমামা চিঁচিঁ করে বললেন, 'মোটেই ওরা আমাকে উদ্ধার করেনি। আমিই বরং—'

গুপি বলল, 'ফের।'

ছোটোমামা থেমে গিয়ে ঢোক গিলতে লাগলেন।

বাবা আর মেজোকাকু একসঙ্গে বললেন, 'এবার তাহলে রহস্য উদ্‌ঘাটন হোক।'

নিতাই সামন্ত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ধৈর্য ধরুন। বিনু তালুকদার হয়তো রিং লিডারদের নিয়ে এখানে আসবেন, মোকাবিলা করতে। অর্থাৎ সবাইকে মুখোমুখি এনে ব্যাপার খোলসা করতে। তেওয়ারি রাখুর দলও আসবে, কিছু আসবাব সরালে ভালো হয়।'

আমি বললাম, 'আমার ঘরে কেন? তার চেয়ে সবাই মিলে বসবার ঘরে গেলে হয়-না?

সামন্ত বললেন, 'আরও ভালো হয় একদল যদি এখনই খেয়ে নেয়। চাঁদু, গুপি, পানু, এরা খেয়ে নিক। দেখো, আবার পালাবার চেষ্টা করলে হুলিয়া লাগিয়ে ধরিয়ে এনে ফাটকে দেব কিন্তু। আর ভালোমানুষের মতো খেয়ে নিলে, তোমাদের স্টেটমেণ্ট নিয়ে, আমার জিপে করে যার যার বাড়ি পাঠিয়ে দেব! তোমরা কিছু আসামি নও, তোমরা হলে পুলিশের পক্ষের সাক্ষী।'

দরজার কাছ থেকে রামকানাই বলল, 'কোনো ভয় নেই। খাবার ফেলে ওনারা সগ্‌গেও যাবেন না। রান্না তৈরি।'

বাবা বললেন, 'চোপ।'

ছোটোমামা বললেন, 'খেয়ে এসে সব বলব। কিন্তু আমাকেও গুপিদের ওখানে পাঠাবেন। বাবার কাছে এমনি গেলে, বাবা দাড়ি ছিঁড়ে দেবেন।'

খেয়ে-দেয়ে সবে এসেছি অমনি আমাদের সদর দরজার ঘণ্টি তিন বার বেজে উঠল। নিতাই সামন্ত লাফিয়ে উঠলেন, 'ওই ওই বিনু তালুকদারের লোকের সংকেত। আপনারা তিনটে বড়ো বড়ো শকের জন্য প্রস্তুত হোন।'

আমার পকেট থেকে বিদ্যুৎ আবার বকম-বকম করতে লাগল। আর নেপো তার পিঠটাকে কুলোর মতো করে, লোম ফুলিয়ে তিনগুণ বড়ো হয়ে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে অদ্ভুত একটা ট্ স্ স্ ফ্ স্ স্ শব্দ করতে লাগল।

এগারো

শেষপর্যন্ত সে-রাত্রে আর কিছু শোনা হল না। ডাক্তারবাবু নিশ্চয় আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিলেন। হঠাৎ কেমন ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে গুপি আমাকে ঠেলে তুলল। রাতে সে বাড়ি যায়নি। আমার ঘরের কৌচে ঘুমিয়েছিল। অথচ আমি সে-বিষয় কিছুই জানি না। ছোটোমামার দেখা নেই।

চোখ খুলতেই গুপি আমার হাতে আমার হারানো খাতা গুঁজে দিল। দুমড়োনো মুচড়োনো আঁচড়ানো কামড়ানো। এই আমার সেই আদি নেপোর বই। পরে গুপি নিয়ে গিয়ে মোড়ের মাথায় দোকান তেকে বাঁধিয়ে দিয়েছে। এতে আমি সমস্ত ব্যাপারটার যতখানি মনে আছে লিখে রেখেছি। যেমন মলাটে 'নেপোর বই' নাম লেখা ছিল, তেমনি আছে। ভেবেছিলাম কেমন বাড়েটাড়ে বাচ্চা বয়স থেকে সব লিখে রাখব। সে আর নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া সব কথা লেখাও যায় না। মহা পাজি।

খাতা পেয়ে অবাক হয়ে উঠে বসে গুপির দিকে তাকালাম। গুপি বলল, 'কাল বড়ো মাস্টারের ঘর থেকে ছোটোমামা ওটাকে উদ্ধার করেছিল।'

এমনি অবাক হলাম যে পায়ের জোর চলে গেল, খাট থেকে পড়ে গেলাম, নিজেই খচমচ করে উঠে বললাম, 'তা-তার মানে?'

খানিকটা তোতলামি এসে গেল। পা জখম হবার পর থেকে একটু তোতলাই। আজকাল প্রায় সেরে গেছে।

গুপি বলল, 'সে অনেক কথা।'

বলে মুচকি হাসতে গিয়ে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে লাগল।

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'পোড়া বউ মরেছে বুঝি?'

গুপি মাথা নেড়ে বলল, 'পোড়া নয়। বউ নয়।'

—'তবে?'

—'ওঁর দাদা।'

আমি বললাম, 'দাদা মরেছে তো তুই কাঁদছিস কেন? তাকে তো চিনিসও না।'

গুপি বলল, 'মরেনি। সামন্ত তিনটে শকের কথা বলেছিল। ওই হল এক নম্বর।'

—'তবে কেন কাঁদছিস্?'

—'উনি বর্মায় যাননি কখনো, জাহাজডুবি হয়নি, বাঁদরদের দ্বীপ থেকে কেউ তাড়ায়নি, ডুবো জাহাজে নেমে সোনা তোলেননি, বনের দেউয়ের পাহাড়ে ওঠেননি। ম্যাও নামে বেড়াল ছিল না। সব বানানো কথা। ওই হল দু-নম্বরের শক্! ওঁর দাদা বলেছে।'

তাই শুনে আমারও কেমন পেট কামড়াতে লাগল। 'তবে কি বউ রামু ডাকাতের মেয়ে নয়?'

গুপি বলল, 'না, না, কারো মেয়ে নয়, বউই নয়, ও-ই দাদা।'

কেমন গোলমাল লাগতে লাগল। 'কার দাদা?'

—'বড়ো মাস্টারের দাদা! মোটর চুরির ব্যাবসা ওঁর। ঠান্ডাঘরের মালিক উনি!'

তারপর আরও খানিকটা কেঁদে বলল, 'স্পেসশিপ তৈরি হয় না ওখানে! চোরাই গাড়ির চেহারা বদলি করা হয়। বিনু তালুকদার সবাইকে ধরেছে। তাই কাল তার আসতে দেরি হল। এসে সব বলে গেল। তুই তখন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লি! আজ আবার আসবে, তোর জবানি নেবে।'

আমি বললাম, 'আ—আ—আমি কী—কী—কী— কীসের বিষয় জবানি দে-ব?'

গুপি অবাক হয়ে বলল, 'বেড়ালের।'

—'কী বেড়ালের জবানি?'

—'নেপো বেড়ালের।'

আমি হাঁ করে তাকিয়েই রইলাম। নেপো ঘরে ঢুকে গুপিকে দেখে রেগে গর—র—র—গ—র—র করতে লাগল। গুপি দুঃখিত হয়ে বলল, 'একরকম বলতে গেলে আমিই ওকে বাঁচালাম আর আমার উপর রাগ দেখাচ্ছে দেখো!'

—'না না, তোর উপরে ঠিক নয়। তুই আমার আলোয়ানের উপর বসেছিস কি না, ওইখানে ও বসে।'

গুপি সরে বসে বলল, 'মাস্টারের দাদা অবসর সময় হার্মোনিয়ম বানাত। অনেক জায়গায় নাকি তার খুব চাহিদা। অনেক পয়সা কামাত।'

আমি বললাম, 'কীরকম হার্মোনিয়ম?'

গুপি অবাক হয়ে গেল। 'কেন, বেড়ালের হার্মোনিয়ম নিশ্চয়। নাকি সন্দেশ পড়ে শিখেছিল। খালি ওই বেড়াল ধরা যা একটা সমস্যা হয়েছিল। সব বেড়ালের সারেগামার সুর ঠিক থাকে না। সুর ঠিক না হলে লোকে কিনবে কেন। বেসুরো গান কে শুনতে চায়?'

কখন যেন বাবা এসে দাঁড়িয়েছিলেন টের পাইনি। বেজায় আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বেড়ালের হার্মোনিয়ম আবার কী?'

আমি বললাম, 'সেই যে সুবিমল রায় সন্দেশে লিখেছিলেন, কে যেন বানিয়েছিল। কাঠের খোপে খোপে বেড়াল বসাতে হয়, তলা দিয়ে ল্যাজ ঝোলে। একেক বেড়ালের একেক সুর হওয়া চাই, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা। ল্যাজ ধরে টানলেই বেড়াল ওই সুরে ম্যাও ধরে। দিব্যি গানটান বাজানো যায়।'

বাবা বললেন, 'পাগল নাকি?'

গুপি একটু চটে গেল। 'না কাকা, পাগল নয়। অনেক বেড়াল জোগাড় করতে হত, তাদের সুর ঠিক চিনে গলায় টিকিট ঝোলানো হত। টিকিট তো সবাই দেখেছে। নেপোর গলাতেও ছিল।'

বড়ো মাস্টার ওর ল্যাজে পা দিতেই ও একেবারে এক টানে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি সা আ-আ করে চেঁচিয়ে উঠে দে পিট্টান। বড়ো মাস্টার বাড়ি গিয়ে দাদার কাছে ওই কথা বললেন! শুনে অবধি দাদা আর বড়ো মাস্টারকে ছাড়ান দেয়নি। ওটি আমার চাই, ডি লুক্স হার্মোনিয়ম বানাব। বড়ো মাস্টার দাদাকে ঘরে আটকে রাখার জন্যে বেড়াল জোগাড় করে দিতেন। নইলে দাদা কোথায় কী করে বসবে তার ঠিক কি। নাকি সতেরো বার জেল খেটেছে, পৃথিবীর নানান দেশে, নানান নামে। ওই ছাদে বেড়ালরা চরত। মাছ আসত ওদেরই জন্যে। কিন্তু বেশি খেলে গলার সুর খোলে না। তাই খাওয়া কমানো হয়েছিল। ঠান্ডাঘরের চোরাই গাড়ির কারখানায় ওরা থাকত। খাওয়া কমানোতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। অমনোনীতরা ছাড়াই থাকত। তেওয়ারি তাদের গলা সাধাত। মহা দৌড়ঝাঁপ করত ওরা। সেদিন ছোটোমামা চোঙা খুলতেই ওরাই নদীর স্রোতের মতো বেরিয়ে এসেছিল। চোঙার বাইরে থেকে মাছের গন্ধ একটুখানি নাকে ঢুকতে-না-ঢুকতেই।'

আমি বললাম, 'আর ছোটোমামা?'

গুপি একটু হাসল। 'ছোটোমামাই তো চোঙা দিয়ে কারখানায় ঢুকে, বেড়ালদের খাঁচা আবিষ্কার করে, নিজেই একেবারে থ। ছোটোমামা একটা হিরো।'

এই বলে গুপি আরও খানিকটা কেঁদে নিল।

আমি বললাম, 'ওরকম করিস না। তাহলে আরেকটা দামোদর ভ্যালি তৈরি হয়ে যাবে।'

গুপি বলল, 'চাঁদে যাবে না বলছে যে। নাকি বড্ড হাঙ্গামা।'

বেজায় রাগ হল। চেঁচিয়ে বললাম, 'চাঁদে যাবে না তো করবেটা কী শুনি?'

গুপি বলল, 'পুলিশে চাকরি নেবে। ওই হল তিন নম্বরের শক!'

—'পু-পুলিশে চাকরি নেবে? সে আবার কী?'

—'বিনু তালুকদার ওকে হাত করেছে বুঝলি-না। ওকে দিয়ে কাজ হাসিল করেছে, এখন আর কি ওকে ছাড়ে।'

বাইরের দরজার ঘণ্টি পড়ল। বাবা লাফিয়ে উঠে বললেন, 'ওই যে মি. তালুকদারের দল এলেন বোধ হয়।'

সঙ্গেসঙ্গে মেজোকাকু আর নিতাই সামন্ত ঘরে ঢুকে ধপাধপ করে একেকটা চেয়ারে বসে, কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন। মেজোকাকু বললেন, 'উঃ, সাধে লোকে ওর নাম দিয়েছিল গোরিলা ঘোষাল! গায়ে কী জোরটা দেখলে? একবার গা ঝাড়া দেয় তো তোমাদের সব চাইতে জোরালো পাঁচ-ছয়টা ছিটকে পড়ে! আবার তেজ কত! বুক চাপড়ে বলল, কী করবি রে তোরা আমার? বউ সেজে ঘোমটা দিয়ে সাত বছর কাটালাম, এখন আর আমার ভয়ডর বলে কিছু নেই। দে না পাঁচ বচরের জন্যে জেলে। পায়ের উপর পা দিয়ে তোদের পয়সায় দু-বেলা খাব আর আমার হার্মোনিয়মের বইটা এই অবসরে লিখে ফেলব!— চাঁদু এল না; কালকের অত উত্তেজনার ফলে ওর পেটের অসুখ করেছে। গুপিদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। বাড়ি গেলে বুড়ো ওকে মাটিতে বিছিয়ে দেবে।'

নিতাই সামন্ত বললেন, 'কী জানি শেষপর্যন্ত গাড়ি চুরির কেসটা টিকবে কি না। ওখানে তো ওই দুটো ভাঙা গাড়ি ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। নাকি গাড়ি সারাবার কারখানা। ও দুটোকে সের দরে কিনেছে। লাইসেন্স নেই বলে লুকিয়ে কাজ করে। এদিকে বেড়ালের হার্মোনিয়ম তৈরি করা কিছু বেআইনি নয়। ওই লাইসেন্স নেই বলেই যা খানিকটা জরিমানা করা যেতে পারে!'

বাবা বললেন, 'সবটা খুলে না বললে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সামন্ত বললেন, 'তাও বুঝলেন না? এর মধ্যে দুটো ব্যাপার জড়িত, এক গাড়ি চুরি, দুই বেড়াল চুরি। চোরের সর্দার কিন্তু একজনই। ওই যে বললাম গোরিলা ঘোষাল, বড়ো মাস্টারের দাদা। ঠান্ডাঘরটা একটা ভাঁওতা। ওটা আসলে মোটরের কারখানা। আমাদের বিশ্বাস চোরাই গাড়ির, কিন্তু তার কোনো প্রমাণ পাচ্ছি না। তা ছাড়া হার্মোনিয়মের কাঠের খোল তৈরি হয় ওখানে। তারই ঠক ঠক শোনা যায়। এঁয়ারা তাই শুনে ওই স্পেসশিপ বানাচ্ছে, বলে আহ্লাদে আটখানা!

দেখলাম চমৎকার ব্যবস্থা। ঠান্ডাঘরের ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে ভিতরে। ছাদের কোনা দিয়ে নাইলনের দড়ির মই বেয়ে ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে বড়ো মাস্টারের ঘরে যাওয়া যায়। আবার সেখান থেকে বড়ো সিঁড়ি দিয়ে ছাপাখানার ভিতরে নামা যায়। নাইট ওয়াচম্যানের ঘরেও ঢোকা যায়। তাড়া খেয়ে গুপিরা তাই করেছিল। তারপর পানু তক্তা ফেলে দিতেই এ-বাড়িতে পালিয়ে আসতে পেরেছিল। নইলে গোরিলা ওদের মেরে পাট করে দিত! তার আগে কী হয়েছিল সেকথা গুপিই ভালো বলতে পারবে। আমি তো তখনও পৌঁছোইনি।'

গুপি দেখলাম খুব খুশি। হাসতে হাসতে বলল, 'ছোটো স্যারের সঙ্গে গলি দিয়ে ঢুকে ও মাথায় গিয়ে দেখি ঠান্ডাঘরের গায়ের ছোটো দরজাটা খোলা, হাওয়ায় দুলছে। ওইখানে গিয়ে ঢুকলাম।

একটা প্যাসেজ দিয়ে যেতেই কারখানা। লোহালক্কড়, কাঠের ডাঁই, যন্ত্রপাতি। তেলে প্যাচপেচে বিশ্রী জায়গা। একটা নিয়নবাতি জ্বলছে। কেউ কোথাও নেই। তারপর একটা ফ্যাঁস ফ্যাঁস ফোঁস ফোঁস ম্যাও-ম্যাও মিউ মিউ শুনে দেখি বিরাট এক খাঁচার খোপে খোপে শত শত বেড়াল। এমন সময় কাতরকণ্ঠে কে বলল, বাঁচাও! এ ছোটোমামা না হয়ে যায় না। দেখি মস্ত খাঁচার এক ধারে আলাদা খোপে গুঁড়ি মেরে ছোটোমামা বসে। ভয়ে আধমরা। চোঙা দিয়ে ওকে নামতে দেখেই কারখানায় যারা কাজ করছিল তারা নাকি ভূ—ত ভূ—ত বলে খিড়কি দোর খুলে দে দৌড়। ছোটোমামা ঘরটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন ছাদ অবধি সিঁড়ি উঠে গেছে।

সিঁড়ি বেয়ে ঠান্ডাঘরের ছাদে গিয়ে দেখেন, সামনে নাইলনের মই ঝুলছে। তাই বেয়ে একেবারে বড়ো মাস্টারের ঘরে, পোড়া বউয়ের মুখোমুখি। কিন্তু সে পোড়া বউ নয়। একহাত ঘোমটা, ঝোলা গোঁপ, মোটা বেঁটে গোরিলা ঘোষাল হার্মোনিয়ম পালিশ করছে। ওকে দেখে সে হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল। তারপর এক মিনিটের মধ্যে বগলদাবা করে, স্বচ্ছন্দে দড়ির মই বেয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে ঠান্ডাঘরে। তারপর বেড়ালের খাঁচার অন্য অর্ধেকে পুরে বাইরে থেকে শিকল তুলে, কাষ্ঠ হেসে, কোনো কথা না বলে, আবার সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য। সেই ইস্তক ছোটোমামা ওইখানে বন্ধ, চ্যাঁচাবারও জো নেই। শব্দ করলেই বেড়ালেরা নাকি নখ বার করে। তারপর সামন্ত সাত-আট জন পুলিশ নিয়ে ঢুকলেন। এসেই আগে খাঁচার দরজা খুলে দিলেন।'

নিতাই সামন্ত খুব হাসতে লাগলেন। 'আর বলেন কেন, দাদা, খাঁচা খুললেও বেরোয় না। টেনে বের করতে হল। তখন আবার কিছুতেই নড়ে না, দ্বিতীয় খাঁচার বেঁড়ে ল্যাজের বেড়ালটাই নাকি নেপো। ওকে না নিয়ে নড়বে না। অগত্যা তাদের সবাইকে ছাড়া হল। তারা আবার আমাদের পা ঘেঁষে সঙ্গেসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল। তারপর সে যা হই হই! গোরিলা ঘোষাল লাঠি হাতে তেড়ে এল। গুপি আর চাঁদু তখুনি দুদ্দাড় দৌড়। পিছন পিছন গোরিলা ছুটল। পানুই শেষটা ওদের বাঁচাল এ আমি বলতে বাধ্য।'

একটু খুশি না হয়ে পারলাম না। নিতাই সামন্ত বললেন, 'অনেক কষ্টে গোরিলাকে ধরা হল। তারপর তাকে আমাদের ভ্যানে তুলে বড়ো মাস্টারের খোঁজে ছাপাখানায় গিয়ে দেখি তিনি চোখে ম্যাগনিফাইং চশমা এঁটে প্রুফ দেখছেন। এতসব কাণ্ড হল, তার কিছুই নাকি টের পাননি! বুঝলেন দাদা, ওই নাইট স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিনু তালুকদারের চর ছিল। দোকানের বুড়ি সেজে ঘুঘু সমাদ্দার খবর সংগ্রহ করে দিত। বিনু তালুকদার একবার ধরলে কাউকে ছাড়ে না। এসব প্ল্যান তারই।'

এই অবধি বলে নিতাই সামন্ত হাতঘড়ির দিকে তাকালেন।

এর মধ্যে বিনু তালুকদার কোত্থেকে এল বুঝলাম না।

বাবা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'মি. তালুকদার তো কই এখনও এলেন না?'

'আসবেন, আসবেন। ওই বড়ো মাস্টারটিকে নিয়েই হয়েছে মুশকিল। সব দেখে-শুনে মনে হয় দাদার সঙ্গে হ্যান্ড-ইন্-গ্লভ যাকে বলে। অথচ বেআইনি কিছু করছেন বলে প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছি না। এদিকে কী বলছেন জানেন, ওঁর দাদার নাকি একা জেলে কষ্ট হবে, ওঁকে সাকরেদ বলে ধরতে হবে। তা হলে নাকি বর্মার জঙ্গলে নাম দিয়ে অদ্ভুত স্মৃতিকথা লেখার সময় পাবেন।'

মেজোকাকুও হেসে কুটোপাটি। 'শোন একবার কথা! লোকটা চব্বিশ পরগনার বাইরে কখনো পা দিল না, উনি আবার বর্মার জঙ্গলে লিখবেন।'

ভীষণ রাগ হল! আমি কিছু বলার আগেই গুপি চেঁচিয়ে-মেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'কিচ্ছু দরকার নেই বর্মা যাবার। লিখতে হলে যাবার দরকার করে না, লিখবার ক্ষমতা থাকলেই হল।'

ঠিক এই সময় সুড়সুড় করে ছোটো মাস্টার ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই গুপি রেগে চতুর্ভুজ হয়ে উঠল। 'কাল আমাকে শত্তুরের গর্তে ঠেলে দিয়ে কোথায় কেটে পড়লেন, স্যার? আমি'—

কানু সামন্ত ছুটে এসে গুপির মুখ চেপে ধরে বলল, 'স্-স্-স্ কাকে কী বলছ! উনিই বিনু তালুকদার, ছোটো মাস্টারের ভেক ধরে এমনকী আমার পর্যন্ত চোখে ধুলো দিয়েছিলেন।'

গুপি আমার দিকে তাকাল। আমি গুপির দিকে তাকালাম। তারপর গুপি ছুটে গিয়ে ছোটো মাস্টারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, 'স্যার, আমিও পুলিশে চাকরি করব।'

বিনু তালুকদার ওর পিঠ চাপড়ে, আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'স্পেসশিপের মডেলটা'—

আমি বললাম, 'বি.এস্সি. পাস করে আমিও পুলিশে ঢুকব। চাঁদে গিয়ে কাজ নেই। যাওয়া হবেও না।'

—'হবে না মানে? এই হল বলে! তারপর স্পেসশিপেও গুপ্ত গোয়েন্দা রাখা হবে। ওঃ, বলতেই ভুলে যাচ্ছিলাম, তোমাদের বড়ো স্যার রবিবারে এসে তোমাদের গল্প বলবেন। বর্মার সব ভালো ভালো অভিজ্ঞতা মনে পড়েছে, এক দিন ফাটকে বসে বসে। এখন স্নান-খাওয়া করতে বাড়ি গেছেন।'

তখন গুপি আর আমি উঠে গিয়ে খাবার ঘরের দিকে চললাম। সঙ্গেসঙ্গে নেপোও চলল। বেঁড়ে ল্যাজ খাড়া করে।